বীরমহিমা।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বীণাযন্ত্র,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা,
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২

বিজ্ঞাপন।

বীরমহিমা দুই ভাগে বিভক্ত—যুদ্ধবীর-চরিত ও নারী-চরিত। যুদ্ধবীর-চরিতে ভারতের কয়েকটি প্রধান বীরপুরুষ এবং নারী-চরিতে কয়েকটি বীর-রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে। অনেক দিন হইল, এই দুই গ্রন্থ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া মুদ্রণজন্য প্রেসে দিয়াছিলাম। কিয়দংশ মুদ্রিত হওয়ার পর নানা কারণে মুদ্রণকার্য্য বন্ধ ছিল। এখন যুদ্ধবীর-চরিত ও নারী-চরিত একত্র করিয়া, উপস্থিত গ্রন্থ প্রকাশ করা গেল।

বীরমহিমার সহিত নারী-চরিত সংযোজিত করা কত দূর সঙ্গত হইল, বলিতে পারি না। যাহা হউক, নারীচরিতে যে সকল বীরাঙ্গনার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা বীরপুরুষের ন্যায় যে, আপনাদের তেজস্বিতা, আত্মত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, মতদ্বৈধ নাই।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

যুদ্ধবীর-চরিত।

নারী-চরিত।

যুদ্ধবীর-চরিত।

প্রতাপ সিংহ।

প্রতাপ সিংহ মিবারের রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। মিবারের রাজবংশীয়দিগের সাধারণ উপাধি 'রাণা'। রাণাগণ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইহাঁরা কহিয়া থাকেন, রামচন্দ্রের পুত্র লব, ইহাঁদের বংশের আদি পুরুষ। লব পঞ্জাবে লবকোট (আধুনিক লাহোর) নামে একটী নগর স্থাপন করেন। এই লবকোট বা লাহোরই রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস-ভুমি। লবের সন্তানগণ বহুকাল লাহোরে বাস করেন, পরে এই বংশের কনকসেন ১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর হইতে দ্বারকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৪৪ অব্দে কনকসেন কর্ত্তৃক বীরনগর নামে একটী নগর স্থাপিত হয়। কনকসেনের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বিজয়সেন বিজয়পুর নামে আর একটী নগর স্থাপন করেন। বর্ত্তমান ধোল্কা এক্ষণে যে স্থলে আছে, অনেকে অনুমান করেন, বিজয়পুর সেই স্থলে অবস্থিত ছিল। বিজয়সেন বিজয়পুর ব্যতীত বিদর্ভ নামে আরও একটী নগরের প্রতিষ্ঠাতা। বিদর্ভের পরিবর্ত্তে পরিশেষে এই নগরের নাম সিহোর হয়। যাহা হউক, বল্লভীপুরই ইহাঁদের রাজধানী ছিল। কালক্রমে অসভ্য জাতির আক্রমণে বল্লভীপুর বিনষ্ট হইলে, অধিবাসিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করে। বল্লভীপুর-রাজ এই বিপ্লবে বিনষ্ট হন, রাণী-

গণ ভর্ত্তার সহিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কেবল অন্যতম রাণী পুষ্পবতী ঘটনাক্রমে স্থানান্তরে থাকাতে এই ভীষণ বিপ্লব হইতে রক্ষা পান। জৈনদিগের গ্রন্থানুসারে এই বিপ্লব ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। ভাওনগরের দশ মাইল উত্তর পশ্চিমে বল্লভীপুর ছিল। এখন এই স্থানের নাম বলভী হইয়াছে।

বল্লভীপুর-ধ্বংসের সময় পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন। বল্লভী-পুরের শোচনীয় সংবাদ পাইয়া, তিনি একটী পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গুহায় তাঁহার একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুষ্পবতী কমলবতী নামে একটী ব্রাহ্মণ-জায়ার হস্তে তনয়ের রক্ষার ভার দিয়া ভর্ত্তার উদ্দেশে চিতায় আরোহণ করেন। গুহায় জন্ম হওয়াতে পুষ্পবতীর তনয়ের নাম গুহ হয়। গুহ পার্ব্বত্য প্রদেশের সমবয়স্ক ভীল বালকদিগের সহিত সর্ব্বদা মৃগয়া করিতেন। তাঁহার সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া এই সকল বনপুত্র * তাঁহাকে বড় স্নেহ করিত। প্রবাদ আছে, একদা এই সকল বালক ক্রীড়াচ্ছলে গুহকে রাজা করে এবং একজন আপনার অঙ্গুলি কাটিয়া তন্নির্গত রক্ত দ্বারা গুহের কপালে টীকা দেয়। এই সময় মণ্ডলিক নামে একজন ভীল ইদর প্রদেশে রাজত্ব করিত। গুহকে সে বড় ভাল বাসিত। মণ্ডলিক লোকমুখে এই রাজ্যাভিষেক-ক্রীড়ার কথা শুনিয়া গুহকে ইদর দেশের অন্তর্গত ইদর গ্রামের আধিপত্য দেয়। কালক্রমে গুহ হিতৈষী মণ্ডলিককে বধ করিয়া সমস্ত রাজ্য আপনার অধীন করেন। এই গুহ হইতে 'গোহিলোট্' অথবা "গেহলোট" (সাধারণতঃ গেলোট) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গুহের সন্তানগণ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য প্রদেশে

* এই সকল বালক সর্ব্বদা বনে বনে বেড়াইত। এজন্য ইহাদের নাম বন-পুত্র অর্থাৎ অরণ্যের সন্তান হয়।

আধিপত্য করেন। অষ্টম ভূপতির নাম নাগাদিত্য। একদা অসভ্য ভীলগণ বিদেশী রাজার শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া নাগাদিত্যের প্রাণ সংহার করে। নাগাদিত্যের বাপ্পা নামে তিন বৎসর-বয়স্ক একটী পুত্র-সন্তান ছিল। একজন ভিল দয়া-পরবশ হইয়া, তাহাকে ভান্দের দুর্গে আনিয়া রক্ষা করে। ভান্দের হইতে বাপ্পা অধিকতর নিরাপদ স্থল পরাশর অরণ্যে আনীত হন। এই অরণ্যের নিকটেই ত্রিকুট পর্ব্বত শির উত্তোলন করিয়া, বিরাট্ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে নগেন্দ্র নগর অবস্থিত। নগেন্দ্র নগর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ এই স্থলে বেদগানে ও বেদোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমস্ত সময় যাপন করিতেন। এই পর্ব্বত-পাদদেশে—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়-ক্ষেত্রে বাপ্পার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে চিতোর রাজ্য প্রমরবংশীয় মোরী ভূপতিদিগের অধীনে ছিল। গুহের গর্ভধারিণী পুষ্পবতী প্রমরবংশীয় চন্দ্রবতী-রাজের দুহিতা। গুহের বংশে বাপ্পা রাওর জন্ম, সুতরাং বাপ্পার সহিত প্রমর-বংশের সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়া, বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হন। চিতোরের তদানীন্তন নরপতি বাপ্পাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। বাপ্পা এইরূপে চিতোরের সেনাপতি হইয়া, কিছুকাল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যুদ্ধে তাঁহার অসাধারণ বিক্রম প্রকাশিত হয়। কালক্রমে মোরী কুলের পতন হয়। বাপ্পা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। কথিত আছে, যখন বাপ্পারাও চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স পনর বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

এই বাপ্পা রায় চিতোরে গোহিলোট বংশের প্রথম রাজা, এবং এই বাপ্পা রাও "হিন্দুকুল-সূর্য্য" বলিয়া রাজস্থানে সম্মানিত। চিতোর-ভূমি যে বীরকুলধাত্রী ও বীরকুলপ্রসবিনী হইয়া সহৃদয় কবির হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারিণী হইয়াছে, এই বাপ্পা রাওই তাহার মূল। বাপ্পা রাওর বংশধরগণ অনেকবার যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া, রাজপুত নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন পানিপথে লোদি বংশের পতন ও মোগল বংশের অভ্যুদয় হয়, তখন বাপ্পা রাওর সন্তানগণ মিবারে বিশেষ পরাক্রমশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বংশে রাণা সংগ্রাম সিংহের জন্ম হয়। রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্রের নাম উদয় সিংহ। সংগ্রাম সিংহ পুত্রের মুখ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; উদয় সিংহের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হয় *। যাহা হউক, উদয়সিংহের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন চিতোরের অন্তর্বিপ্লবে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। উদয় সিংহ স্নেহময়ী ধাত্রী ও একজন বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারের কৌশলে এই অন্তর্বিপ্লবের অধিনায়ক করাল শত্রু বনবীরের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন †। রাণা

---

* কথিত আছে, সংগ্রাম সিংহ সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে রাজ-মন্ত্রিগণ বিরক্ত হইয়া বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করেন।

† বনবীর সংগ্রাম সিংহের দাসীপুত্র। উদয় সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ্য-লোলুপ বনবীর দীর্ঘকাল আপনার রাজত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য, উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হন। একদা রাত্রিকালে উদয় সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময় একজন ক্ষৌরকার উদয় সিংহের ধাত্রীকে এই ভয়ানক সংবাদ জানায়। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটী ফলের চাঙ্গারির মধ্যে নিদ্রিত উদয় সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে আচ্ছন্ন করিয়া, ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করে। বিশ্বস্ত ক্ষৌর-কার সেই চাঙ্গারি লইয়া, নিরাপদ স্থানে যায়। এমন সময়ে বনবীর

সংগ্রামসিংহের সন্তানের জন্য রাজপুত ধাত্রীর এই কৌশল জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। যে চিতোরের জন্য, বাপ্পা রাওর বংশ রক্ষার নিমিত্ত, অবলীলাক্রমে স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন ও প্রীতির একমাত্র পুত্তলী শিশু সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কতদূর উচ্চভাবের পরিচায়ক! যে স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ হৃদয়-রঞ্জন কুসুম-কলিকাকে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্বিতা ও কতদূর স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিপোষক! প্রকৃত তেজস্বী ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজস্বিনী নারীর হৃদয়গত মহান্ ভাব বুঝিতে পারিবেন না। ভীরু প্রকৃতি, ধাত্রীকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তেজস্বিনী প্রকৃতি তাহাকে মূর্ত্তিমতী হিতৈষিতা বলিয়া, চিরকাল যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে। ফলে ধাত্রীর নিঃস্বার্থ হিতৈষণা তাহার রাক্ষসী ভাবকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সাধারণে এমন অসাধারণ ভাব মনেও ধারণা করিতে পারে না। যাবৎ হিতৈষণা ও তেজস্বিতার সম্মান থাকিবে, তাবৎ এই স্বার্থত্যাগ ও তেজস্বিনী পন্নার নাম কখনও ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

চিতোর হইতে পলায়নের পর উদয় সিংহ বহুকাল পন্নার তত্ত্বাবধানে দেশান্তরে রক্ষিত হন। কালক্রমে মিবারের সর্দ্দারগণ উদয় সিংহকেই চিতোরের বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উদয় সিংহের অনুকূলে মিবারের প্রধান প্রধান লোক

অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া, ধাত্রীর নিকট উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ধাত্রী বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করে। বনবীর উদয় সিংহ বোধে সেই ধাত্রী পুত্রেরই প্রাণসংহার করিয়া চলিয়া যান। এদিকে রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদন ধ্বনির মধ্যে ধাত্রীপুত্রের প্রেতকৃত্য সম্পন্ন হয়। ধাত্রী নীরবে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখিয়া, ক্ষৌরকারের নিকট গমন করে। এই ধাত্রীর নাম পন্না।

সমবেত হইয়া, যুদ্ধ উপস্থিত করাতে বনবীর চিতোর পরিত্যাগ করিয়া, দেশান্তরে যাইতে অনুমত হন, সুতরাং উক্ত রাজ্য উদয় সিংহের অধীন হয়। এইরূপে প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, বহুকাল দেশান্তরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, উদয় সিংহ ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বাপ্পা রাওর সিংহাসনে সমাসীন হন। রাজ্যপ্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে তিনি ঝালোর রাওর ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতীই প্রতাপ সিংহের জননী ও জনক।

প্রতাপ সিংহ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার সমকালে রাজস্থানের বড় শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়, মোগলদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণই এই দশাবিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ। এই আক্রমণের সময় ধরিলে প্রতীত হইবে, প্রতাপ সিংহ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ভূমিষ্ঠ হন। যাহা হউক, যে সময়ে বাপ্পা রাওর টীকা প্রতাপের ললাটদেশ শোভিত করে, সে সময়ে বীর-প্রসবিনী চিতোর-ভূমি কিরূপ অবস্থায় ছিল, এক্ষণে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

রাজস্থানের প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দে কহিয়াছেন, "যে স্থানে বালক রাজত্ব করে, কিম্বা স্ত্রীলোক শাসন-কার্য্য চালায়, সে স্থানকে ধিক্। যে স্থলে এই উভয়ের সমাবেশ হয়, সে স্থলের দুর্দ্দশার আর অবধি থাকে না।" চিতোরের রাজা উদয় সিংহ এই বালক ও নারী, উভয়েরই প্রকৃতি ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে তেজস্বিতা ও বীরত্বের আধার ছিলেন, সেই তেজস্বিতা ও বীরত্বে উদয় সিংহের প্রকৃতি সমুন্নত হয় নাই। উদয় সিংহ প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন। প্রতাপ সিংহের জন্মদাতার এরূপ নিস্তেজ

নারী-প্রকৃতি বীরভূমি চিতোরের ইতিহাসে দুর্লভ। এই সময়ে আকবরের ন্যায় একজন সুযোদ্ধা ও দিগ্বিজয়-পটু সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, উদয় সিংহ চিতোরে সংযত-চিত্ত তপস্বীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা উদয় সিংহের ললাটে সেরূপ শান্তি লিখেন নাই। উদয়সিংহ চিতোরে থাকিয়া, শান্তি-সুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না। এই সুখ-লাভের আশায় তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তবে কি রাজপুত বিলাস-সুখের জন্য লালায়িত? রাজস্থানের থর্ম্মাপলি* ও কাঙ্গ্রা (দুর্গপ্রাচীর) তবে কি অলীক? ইতিহাসের অনুসরণ কর, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।

যে বৎসর উদয় সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তিতে কমলমীর† প্রাসাদ হইতে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হয়, সেই বৎসরই ক্রন্দন-ধ্বনির মধ্যে অমরকোটে একটী বালক জন্মগ্রহণ করে। কমলমীরের আনন্দ-স্বর সমস্ত মিবারে পরিব্যাপ্ত হয়, অমরকোটের শোক-স্বর নগর-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া বৃক্ষলতা-শূন্য বিজন মরুভূমির বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। উদয় সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করাতে, কমলমীরের জনগণ সমবেত ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে ধন দান করে, অমরকোটের বালক জন্মগ্রহণ করাতে, তাহার পিতা অন্য সম্পত্তির অভাবে একটী সামান্য কস্তুরী খণ্ড খণ্ড করিয়া, সমবেত বন্ধুজনের মধ্যে বিতরণ করেন। এক সময়ে চিতোরের উদয় সিংহের সহিত অমরকোটের বালকের এইরূপ

---

* থর্ম্মাপলি গ্রীস দেশের একটী প্রসিদ্ধ গিরি-সঙ্কট। এই স্থানে গ্রীক সেনাপতি লিও-নিদস স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। হলদিঘাট রাজস্থানের থর্ম্মাপলি।

† কমলমীরের প্রকৃত নাম কুম্ভমেরু। রাণা কুম্ভ এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

প্রভেদ ছিল, এক সময়ে একের সিংহাসনে অধিরোহণ ও অপরের জন্মগ্রহণ এইরূপ বিসদৃশ ঘটনায় সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিবর্তনশীল সময়ের সহিত পরিশেষে এই মরু-প্রান্তবর্ত্তী বালকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। কালে এই বালকের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে, এবং কালে এই বালকের উদ্দেশে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি ইন্দ্রপ্রস্থের বিচিত্র সভা হইতে সমুত্থিত হইয়া, সুদূর গগনতলে বিলীন হয়।

এই বালকের নাম আকবর। হুমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরে ছিলেন, তখন বিস্তীর্ণ ভারত-মরুর এক খণ্ড ওয়েসিসে ভারতের এই ভাবী সম্রাট্ ভূমিষ্ঠ হন। হুমায়ুন যেরূপে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুরবস্থায় পড়েন, তাহা ইতিহাসে সবিশেষ বর্ণিত আছে। এস্থলে তদ্বিষয় উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুত্রের জন্ম-সময়ে হুমায়ুনের ললাট হইতে রাজ-টীকা বিচ্যুত হইয়াছিল, হস্ত হইতে রাজ-দণ্ড অপহৃত হইয়াছিল এবং দেহ হইতে রাজ-পরিচ্ছদ অপসারিত হইয়াছিল, দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকা মোগলের পরিবর্ত্তে শূরবংশের শাসন-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল, এবং দিল্লীর রত্ন-খচিত সিংহাসন মোগল-বংশীয়ের পরিবর্ত্তে শূরবংশীয় সের শাহের দেহ-কান্তিতে শোভিত হইতেছিল।

হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, দেশান্তরে বার বৎসর অতিবাহিত করেন। এই অনতি-দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শূরবংশীয় ছয় জন রাজা ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সকলের শেষের রাজার নাম সেকন্দর। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের পরাক্রমে সেকন্দর শূর পরাজিত ও রাজ্য হইতে তাড়িত হন।

এই সময়ে আকবরের বয়স বার বৎসর। এই বয়সেই তাঁহার পিতামহ বাবর ফর্গণার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সেকন্দরের পর হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির ছয় মাস পরে তিনি একদা স্বীয় পুস্তকালয়ের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এই আঘাতেই তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হয়। প্রাচ্য ভূপতিগণ পুস্তকালয়ে থাকিয়া, পুস্তক পাঠে অনেক সময় যাপন করিতেন। তাঁহাদের নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীরও সমাদর ছিল। তাঁহাদের সভা, পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিত। প্রাচ্য দেশের সভামণ্ডপ যে সমস্ত কবি, ঐতিহাসিক, গণিতবিৎ ও দার্শনিক প্রভৃতিতে গৌরবান্বিত থাকিত, ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তি-কলাপ কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে সাম্রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। হুমায়ুনের রাজ্যচ্যুতির পর অধিকাংশ প্রদেশই একে একে দিল্লীর শাসন-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আকবর তের বৎসর বয়সে এইরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। কিন্তু বহরাম খাঁর সাহস ও কার্য্যপরায়ণতায় দিল্লীর সাম্রাজ্য পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা পাইল। বহরাম কাল্পী, চন্দেরী, কলিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব দিল্লীর অধীন করিলেন। ভারতীয় সলি* এইরূপে ভারতবর্ষে মোগল-শাসন বদ্ধমূল করিয়া, পরিশেষে এই মোগল শাসনের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেন। যাহা হউক,

* সলি ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্থ হেন্‌রীর রাজস্ব-সচিব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল।

বহরামের বিদ্রোহে আকবরের কোন অনিষ্ট হইল না। আকবর অবিলম্বে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া, নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন।

সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলে, আকবর দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। রাজপুত-রাজ্যই তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠে। আকবর, মাড়বারের একটী নগর নষ্ট করিয়া ১৫৬৭ অব্দে চিতোরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালন করেন।

যে রাজ্যে রাজত্ব আইনে নিবদ্ধ, রাজা কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় আইনের অনুগামী, সেই রাজ্য কি সুখময়! কিন্তু যে রাজ্যে আইন রাজার অনুগামী, সেই রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল রাজার অনুগত হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে, সেই রাজ্য উন্নতির শিখরে সমারূঢ় হয়; রাজা পাপপরায়ণ হইলে, সেই রাজ্য অবনতির চরম সীমায় পতিত হইয়া থাকে; রাজা শৌর্য্য ও সাহস-সম্পন্ন হইলে, সেই রাজ্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে; রাজা ভীরু-স্বভাব হইলে, সেই রাজ্য শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন হইয়া যায়। দিল্লীর আকবর শাহ ও চিতোরের উদয় সিংহের রাজত্ব ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল।

উদয় সিংহ যে বয়সে চিতোরের অধিপতি হন, আকবরও সেই বয়সে দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে এইরূপ বয়ঃক্রমের সমতা থাকিলেও, অন্যান্য অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল। হুমায়ুন বাবরের নিকটে যেরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, আকবরও হুমায়ুনের নিকটে সেইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন। পিতামহের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আকবর ক্রমে কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হইয়া উঠেন।

এদিকে বহরম খাঁ, আবুল ফজেল ও তোড়রমল্লের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ শাসনকার্য্যে আকবরের সহায়তা করেন। যে সৌভাগ্য-নক্ষত্র তাঁহার জন্ম-সময়ে অমরকোটের মরুভূমি উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, দিল্লীর রাজত্ব-সময়ে ক্রমেই তাহা উজ্জ্বল হইতে থাকে। উদয় সিংহ এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই, এমন কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়াও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। মোগল ও রাজপুতের মধ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ও শাসনোচিত ক্ষমতার বিভিন্নতা ছিল। একজন অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া, নানাস্থানে যাইয়া, মানবচরিত্রে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অন্য জন প্রাচীর বেষ্টিত পর্ব্বত-দুর্গে জন্মিয়া সঙ্কুচিত বিষয়ের সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিলেন। অবারিত সংসার এক জনের বৈষয়িক জ্ঞান প্রসারিত করিয়াছিল, সঙ্কীর্ণ গিরি-কন্দর অপরের বৈষয়িক জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল।

আকবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা। তিনি প্রথমে রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব হরণ করেন। সাহাবুদ্দীন ও আলার ন্যায় তিনিও রণমত্ত রাজপুতদিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন। যে ধর্ম্মান্ধতা পাঠান রাজত্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ আকবরের রাজত্বেও প্রকাশ পায়। আকবর, আলার ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য দেবতা একলিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ দ্বারা আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের জন্য মম্বা (বেদি) নির্ম্মাণ করিতেও ক্রটী করেন নাই। এরূপ অন্ধবিশ্বাসী হইলেও এক সময়ে আকবরের কীর্ত্তিতে মোগল সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এবং এক সময়ে আকবর অসীম প্রতাপশালী হইয়া, চতুর্দ্দিকে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন।

আকবর সৈন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে, উদয় সিংহ জয়মল্ল নামক প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের হস্তে নগর রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। জয়মল্ল সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি শূরোচিত গুণ সমূহে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট দক্ষতার সহিত চিতোর রক্ষার বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিতোর দীর্ঘকাল তাঁহার রক্ষাধীন থাকে না। জয়মল্ল একদা রাত্রিকালে মশালের আলোকে নগরের ভগ্ন প্রাচীরের সংস্করণ দেখিতে ছিলেন, ইত্যবসরে আকবর শাহ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, লক্ষ্য শুদ্ধি পূর্ব্বক তৎপ্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। গুলির আঘাতে জয়মল্লের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। এইরূপ গুপ্তহত্যা আকবরের চরিত্রের একটী দেদীপ্যমান কলঙ্ক। সম্মুখ যুদ্ধ করাই যুদ্ধবীরের চিরন্তন পদ্ধতি, গোপনে নিরস্ত্র শত্রুর প্রাণ সংহার করা নৃশংসতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। বলা বাহুল্য, আকবর অন্যান্য সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও, উপস্থিত স্থলে এইরূপ নৃশংসতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সেনাপতির বিরহে চিতোর-বাসিগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান প্রধান বীরগণের পতন হয়। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে পুত্ত চিতোরের সৈন্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। পুত্ত ষোড়শবর্ষীয় বালক। কিন্তু এই বালকের হৃদয় সাহসে পূর্ণ ছিল। বস্তুতঃ শৌর্য্য ও বীর্য্যে পুত্ত পৃথিবীর আরাধ্য দেবতা। স্বদেশবৎসলতার জন্য পুত্তের নাম অমরশ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য; পিতা রণস্থলে দেহত্যাগ করিলে, পুত্ত অতুল সাহস সহকারে যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া, "রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা,

জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত মৃত্যুও শ্রেয়স্কর' বলিয়া বিদায় দেন। পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পুত্তের অসাধারণ পরাক্রমে যবন সৈন্য বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়া উঠে। এইরূপ লোকাতীত উৎসাহ-সহকারে যুদ্ধ করিয়া, পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেন। আকবর শাহ শত্রুর শূরোচিত গুণ বিস্মৃত হন নাই। তিনি এ বিষয়ে বিশিষ্ট উদারতা দেখাইয়া, প্রকৃত যুদ্ধবীরের সম্মান রক্ষা করেন। জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্বে আকবরের হৃদয় এতদূর আকৃষ্ট হয় যে, তিনি তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে ত্রুটী করেন নাই। এতদ্ব্যতীত আকবর তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ডকায় হস্তী নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার উপর জয়মল্ল ও পুত্তের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ারের সময়েও এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় যথাযথ অবস্থায় ছিল। আকবর এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

পুত্তের প্রাণবায়ুর সহিত চিতোরের সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়। চিতোরবাসিগণ আপনাদের দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া উঠে। আট হাজার রাজপুত একত্র হইয়া, শেষ বীড়া* ভক্ষণ করে। অপর দিকে রাজপুত-মহিলাগণের চিতানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এইরূপ করাল নরশোণিত-প্রবাহ ও করাল হুতাশন-শিখার মধ্যে বীরভূমি চিতোর মোগলের হস্তগত হয়।

কার্থেজের প্রসিদ্ধ বীর হানিবল 'কানি' সমরে জয়ী হইলে, আপনার কৃতকার্য্যতার পরিচয়ার্থ রোমকদিগের অঙ্গুরীয়ক

* বীড়া অর্থাৎ সজ্জিত তাম্বূল। বিদায় সময়ে রাজপুতদিগের মধ্যে বীড়া প্রদানের পদ্ধতি আছে।

সমূহ আহরণ পূর্ব্বক, ধামা দ্বারা পরিমাণ করিয়াছিলেন। আকবরও এইরূপে রাজপুতদিগের উপবীত সমূহ উন্মোচন পূর্ব্বক পরিমাণ করেন। পরিমাণে উহা ৭৪॥০ মণ* হয়। রাজস্থানের ব্যবসায়িগণের মধ্যে পত্রপৃষ্ঠে এই ৭৪॥০ এর অঙ্কপাতের পদ্ধতি আছে। ইহার অর্থ এই, যাঁহারা এই পত্র উন্মোচন করিবেন, চিতোর-ধ্বংসের সমস্ত প্রত্যবায়-ভার তাঁহাদের স্কন্ধে পতিত হইবে। অনেক স্থানে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচার দৃষ্ট হয়। বহুশত বৎসর অতীত হইল, চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছে, অদ্যাপি ৭৪॥০ পত্র-পৃষ্ঠে জাজ্জ্বল্যমান থাকিয়া এই শোচনীয় সংবাদ সাধারণের কর্ণে কর্ণে কহিয়া বেড়াইতেছে।

উদয় সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া, আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; পরিশেষে তথা হইতে আরাবলী পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হন। চিতোর-ধ্বংসের পূর্ব্বে উদয় সিংহ এই উপত্যকার প্রবেশপথে একটী হ্রদ খনন করাইয়া, তাহার নাম "উদয় সাগর" রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি এই স্থানে একটী নগর স্থাপন করিয়া, নিজের নামানুসারে উহার নাম, উদয়পুর রাখেন।

উদয় সিংহ চিতোর ধ্বংসের পর চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ২৫টী পুত্র সন্তানের মধ্যে প্রতাপ সিংহ পৈতৃক উপাধি ও গদির উত্তরাধিকারী হন।

এইরূপে প্রতাপ বংশানুগত "রাণা" উপাধি ধারণ করিলেন। এইরূপে মিবারের গৌরব-সূর্য্য সমুজ্জ্বল হইবার সূত্রপাত হইল। যদিও চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, যদিও যবনের পরাক্রমে রাজপুতগণ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি প্রতাপের

* এ স্থলে মণের পরিমাণ চারি সের।

হৃদয় বিচলিত হয় নাই। তিনি চিতোর উদ্ধার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ বাপ্পা রাওর মন্ত্রপূত শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ তিনি এই সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবেন না; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ গোহিলোট বংশের গৌরব, মিবারের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। প্রতাপ এইরূপ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্চতর সঙ্কল্প, মহত্তর সাধনা তাঁহার হৃদয়কে উচ্চতর করিয়া তুলিল। তিনি স্বদেশ-হিতৈষণা, স্বজাতি-প্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হইয়া, অনুচরবর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপের এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজপুতগণ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মাড়বার, আম্বের, বিকানের এবং বুঁদীর অধিপতিগণও স্বজাতি-প্রিয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া, আকবরের পক্ষ সমর্থনে ত্রুটী করিলেন না। অধিক কি, তাঁহার ভ্রাতা শক্তও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, শত্রু-দলে মিশিলেন। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রতাপ ইহাতেও হতাশ্বাস হইলেন না; তিনি বাপ্পা রাওর শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া, স্বদেশের উদ্ধারার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

প্রতাপ এইরূপে স্বজাতি, স্ববন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, ২৫ বৎসর কাল দুর্ব্বারপরাক্রম মোগল-শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই সময়ে এক এক বার তাঁহার দুরবস্থার এক শেষ হয়। স্বয়ং পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, স্ত্রী পুত্রের সহিত পার্ব্বত্য ফল খাইয়া, কষ্টে জীবন ধারণ করেন, তথাপি তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ স্বাধীনত্ব-প্রিয়তা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

চিতোর ধ্বংসের স্মরণার্থ প্রতাপ সর্ব্বপ্রকার বিলাসদ্রব্যের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া, বৃক্ষ-পত্রে অন্ন আহার করিতেন, দুগ্ধ-ফেণ-নিভ কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, তৃণাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতেন এবং ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন। তাঁহার আজ্ঞায় অগ্রবর্ত্তী রণ-দুন্দুভি, সকলের পশ্চাতে ধ্বনিত হইত। মিবারের এই শোকচিহ্ন আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত প্রতাপের বংশীয়গণ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আহার-পাত্রের নীচে বৃক্ষ-পত্র ও শয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া থাকেন।

প্রতাপ পৈতৃক গদিতে আরোহণ করিয়া, কতিপয় অভিজ্ঞ সর্দ্দারের সাহায্যে শাসন-কার্য্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন; যে কয়েকটী পার্ব্বত্য দুর্গ হস্তে ছিল, তৎসমুদয় দৃঢ় করিলেন। যত দিন মোগলদিগের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ততদিন তাঁহার আজ্ঞায় বনাস ও বেরিস নদীর উভয় তীরবর্ত্তী উর্ব্বর ভুমিতে কেহই থাকিতে পারিত না। নিজের আদেশ যথাবিধি পালিত হয় কি না, তাহার প্রতি প্রতাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই কতিপয় অশ্বারোহি-সমভিব্যাহারে স্থানীয় লোকের কার্য্য-কলাপ দেখিতেন। তাঁহার কঠিন আদেশে উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল বিজন মরু-ভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ রহিয়াছিল, তৃণরাজি শস্য-সমূহের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, গন্তব্য পথ কণ্টকাকীর্ণ বাবলা বৃক্ষে অগম্য হইয়াছিল এবং মনুষ্যের আবাস-ভূমি বিবিধ বন্য জন্তুর বিহার-ক্ষেত্র হইয়াছিল। প্রতাপ এইরূপে সমুদয় ভূমি জঙ্গলময় করিয়া, বিজেতা মোগলদিগের লাভের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যে সমস্ত রাজপুত মোগলদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে

আবদ্ধ ছিলেন, প্রতাপ সিংহ তাঁহাদিগকে সাতিশয় ঘৃণা করিতেন। আম্বেরের রাজা মানসিংহের সহিত আকবরের এইরূপ সম্বন্ধ থাকাতে প্রতাপ মানসিংহের সহিত সমুদয় সামাজিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দেন। একদা মানসিংহ সোলাপুর অধিকার করিয়া, হিন্দুস্থানে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। প্রতাপ সিংহ এই সময়ে কমলমীরে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি আম্বের-রাজের অভিনন্দন জন্য উদয়সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বে এই স্থানে একটী সমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন হইল, প্রতাপের পুত্র কুমার অমর সিংহ, রাজা মানের অভ্যর্থনার জন্য এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন; মানসিংহ নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমাগত হইলে, অমর সিংহ পিতার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাকে ভোজন-স্থলে বসাইলেন। মানসিংহ প্রতাপের সহিত একত্র ভোজন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে, প্রতাপ দুঃখ সহকারে বলিয়া পাঠাইলেন, যিনি তুরুক-কে নিজের ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যিনি তুরুকের সহিত আহারও করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন না। রাজা মান, প্রতাপ সিংহের এই বাক্যে অপমান জ্ঞান করিয়া, ভোজন-স্থল হইতে গাত্রো-থান করেন। প্রতাপ সিংহ এই সময়ে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা মান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "যদি আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব না করি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে।" মানসিংহ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে, পবিত্র গঙ্গাজল দ্বারা ভোজন-স্থান ধৌত করা হয়, এবং যাঁহারা এই ভোজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্নান করিয়া, বস্ত্রান্তর গ্রহণ করেন। এই সমস্ত বিবরণ

আকবর শুনিলেন। তিনি মানসিংহের সহিত প্রতাপ সিংহের তাদৃশ ব্যবহারে, আপনাকে যার পর নাই অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অবিলম্বে এই অপমানের প্রতিশোধ জন্য সংগ্রামের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। যুবরাজ সেলিম সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া, মানসিংহ ও মহব্বত খাঁর সহিত প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপ বাইশ হাজার রাজপুতের সাহস ও স্বদেশীয় পর্ব্বত-মালার উপর নির্ভর করিয়া, আকবর-তনয়ের গতি প্রতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। যে স্থলে তাঁহার সৈন্য সন্নিবেশিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় আট মাইল। এই স্থান কেবল পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। ইহার উত্তর, পশ্চিম, ও দক্ষিণ, সকল দিকেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই গিরি-সঙ্কট হলদিঘাট নামে প্রসিদ্ধ। প্রতাপসিংহ মিবারের আশা-ভরসার স্থল চৌহান, রাঠোর, ঝালাবংশের রাজপুতদিগের সহিত এই গিরি-সঙ্কট আশ্রয় করিয়া, দণ্ডায়মান হন। হলদি ঘাটের যুদ্ধের দিন রাজপুত বীরের অনন্ত উৎসবের দিন। রাজপুতগণ এই উৎসবে আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভুত হইতেছিল। এই মহা উৎসবে প্রতাপ সিংহ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আম্বের-রাজ মানসিংহের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু মানসিংহ দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে ছিলেন, প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পারিলেন না; মেঘ-গম্ভীর স্বরে মানসিংহকে কাপুরুষ, রাজপুত-কুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা মান প্রতাপের এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর যুবরাজ সেলিম হস্তীতে আরোহণ করিয়া যে দিকে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, প্রতাপ সেই

দিকে অসি চালনা করিলেন। এক এক আঘাতে সেলিমের দেহ-রক্ষকগণ ভূমিশায়ী হইতে লাগিল। হস্তীর মাহুত প্রাণ-ত্যাগ করিল। প্রতাপ নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তিন বার মোগল সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন বার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়া তাঁহাকে তিন বার এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণ রক্ষার জন্য তাহারা আত্ম-প্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপ সিংহ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শরীরের এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বর্শার আঘাত এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি এইরূপে সপ্ত স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি উন্মত্ত ভাবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতগণ আবার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। চৌহান রাঠোর, ঝালা-কুলের প্রায় সকলেই গরীয়সী জন্মভুমির রক্ষার জন্য অসি হস্তে করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভুত হইয়াছিল; প্রতাপকে উদ্ধার করা এবার অসাধ্য বোধ হইল। দৈলবারার বীরমল্ল ইহা দেখিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার সৈন্য লইয়া প্রতাপের দিকে ধাবমান হইলেন। এবার মোগলের ব্যূহ ভেদ হইল। প্রতাপ সিংহ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বীরমল্ল ফিরিলেন না। প্রভুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণভূমির ক্রোড়-শায়ী হইলেন। প্রতাপ বীরমল্লের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দৈলবারা! আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিলে। আসন্ন-মৃত্যু দৈলবারা অস্পষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, "রাজপুত বীরধর্ম্ম জানে। বিপৎকালে মহারাণাকে ত্যাগ করে না।" মোগল সৈন্য রাজপুতের বিক্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতের জয় লাভ

হইল না। মোগল সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারি দিকে ছাইয়া পড়িয়া ছিল। তাহারা হটিল না। চৌদ্দ হাজার রাজপুতের শোণিতে হলদিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হলদিঘাটের সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হলদিঘাট রক্ষার্থ অম্লান বদনে, অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। হলদিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপ সিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র-সমাজে হৃদয়গত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া, অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

প্রতাপ সিংহ অনুচর-বিহীন হইয়া চৈতক নামে নীলবর্ণ তেজস্বী অশ্ব-আরোহণে রণস্থল ত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হয়, তখন চৈতক লম্ফ প্রদানে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধ-স্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রতাপ পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শক্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রতাপের শত্রু। তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রতাপ এই ক্ষত্রকুলের কলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। তিনি হলদিঘাটে জ্যেষ্ঠের অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়া-

ছিলেন, স্বদেশীয়গণের দেশ-হিতৈষিতার পরিচয় পাইয়া ছিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এখন আর ক্ষত্রিয়-শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজল নয়নে জ্যেষ্ঠের পদানত হইলেন। প্রতাপ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। বহু দিনের শত্রুতা অন্তর্হিত হইল। প্রতাপ প্রগাঢ় স্নেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন। এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। এ দিকে পথে চৈতকের প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আজ পর্য্যন্ত এই স্থান "চৈতক্‌কা চবুতর্‌" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হলদিঘাট মিবারের গৌরব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এ দিকে সেলিম বিজয়ী হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কমলমীর ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল; প্রতাপ সন্তানবর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণ-কারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর আসিতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না; প্রতি নূতন বৎসর নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপ অটল রহিলেন, মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। ক্রমে মিবারের আকাশ অধিক অন্ধকারময় হইতে লাগিল, ক্রমে পরাক্রান্ত শত্রু অনেক স্থানে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, তথাপি প্রতাপ অটল রহিলেন, বাপ্পারাওর শোণিত কলঙ্কিত করিলেন না। এই সময় প্রতাপ সিংহ এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ

তাঁহার পরিবারবর্গকে একটী নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া, আহার দিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করে।

প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঈদৃশী হিতৈষণায় বিমোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক, এই ভাবে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভুমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের সমুদয় রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রুরও প্রশংসাভাজন হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানগণের কষ্ট এক এক সময় তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি পাঁচ বার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন-পর হন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ মলনামক ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। এই খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময় ভোজন করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপের একটী দুহিতা এই অবশিষ্ট রুটী লইয়া খাইতেছিল, এমন সময়ে একটী বন্য বিড়াল তাহার হস্ত হইতে সেই রুটীখানি কাড়িয়া লয়। বালিকা আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠে; প্রতাপ অদূরে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার রোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটীখানি অপহৃত হইতেছে। বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপ অম্লান বদনে হলদি-

ঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-স্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লান বদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মানরক্ষার্থ আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লান বদনে রাজপুত বংশের গৌরব রক্ষার জন্য রণস্থলবর্ত্তিনী করাল সংহার-মূর্ত্তির বিভীষিকায় তাচ্ছীল্য দেখাইয়া কহিয়াছিলেন "এই ভাবে দেহ-বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাতর স্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল, যেন শত শত কাল-ভুজঙ্গ আসিয়া, সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল, প্রতাপ আর যাতনা সহিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে আকবর নগরমধ্যে মহোল্লাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকানেরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বজাতি-হিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ আর কাল বিলম্ব না করিয়া, নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটী কবিতা রচনা পূর্ব্বক, প্রতাপের নিকট পাঠাইলেন;—

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশা ভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। রাণা এখন সে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্বগৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, আকবর সকলকেই এই

সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে আকবর এক জন ব্যবসায়ী; তিনি সকলই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলই হত-শ্বাস হইয়া, নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের এই ব্যবসায়ী কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবে না। এক দিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অবসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।”

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শত সহস্র রাজপুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের মুহ্যমান দেহে জীবনী-শক্তি দিল এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্য্য সাধনে সমুত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে পারিলেন না; মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধুনদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-

গণের সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন। এই সম্পত্তি এত ছিল যে, ইহা দ্বারা বার বৎসর পঁচিশ হাজার ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহস সহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল। প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া, আরাবলী অতিক্রম করিলেন। মোগল সেনাপতি শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে ছিলেন, প্রতাপ প্রবলবেগে আসিয়া মোগল সৈন্য আক্রমণ করিলেন। দেওয়ীরের যুদ্ধে প্রতাপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ খাঁ হত হইলেন। ক্রমে কমলমীর ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। এই বিজয়-বার্ত্তা আকবর শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল দশ বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারে যে বিজয়-শ্রী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ এক দেওয়ীরের যুদ্ধে তাহা আপনার করায়ত্ত করিলেন। ইহার পর মোগল সৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল না। প্রতাপের বিজয়-লক্ষ্মী অটল থাকিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও, প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বত-শিখরে উঠিলেই তাঁহার নেত্র চিতোরের দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত; অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে বাপ্পা রাওর জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাজপুতকুল-গৌরব সমর সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ দৃষদ্বতী নদীর তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাদল, জয়মল্ল ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে অম্লান বদনে—অক্ষুব্ধ হৃদয়ে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ

করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোর শ্মশান, আজ সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈল-শ্রেণীর সাদৃশ্য বহন করিতেছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দ্দাহে প্রতাপ তরুণ বয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্রই তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ পেশোলা হ্রদের তীরে আপনাদের দুর্গতির সময় ঝড় বৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমর সিংহের প্রতি আস্থা-শূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমর সিংহ নিরতিশয় সৌখীন যুবা; রাজ্য রক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহ্য হইবে না। তনয়ের বিলাসপ্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন; অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্ন-মৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। এক জন সর্দ্দার এই কষ্ট দেখিয়া, প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।" পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হয়ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয়ত তাহা 'এই কুটীরের সঙ্গে

সঙ্গেই তাহা বিলুপ্ত হইবে।” সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, “যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।” প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

এইরূপে ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হইল। যদি মিবারের থিউকিদিদিস অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে “পেলপনিসসের সমর” অথবা “দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন”* কখনও এই রাজপুত-শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুর ভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবল-পরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়-সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এজন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন স্বদেশহিতৈষিতা রাজপুতের মনে অঙ্কিত থাকিবে, তত দিন প্রতাপ সিংহের এই দেব-ভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

---

* গ্রীসের দুটী নগর স্পার্টা ও এথেন্স। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়া পরবশ হইয়া, সমর-সজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথিনার তিনটী সংগ্রাম হয়। ইহাই “পেলপানিসসের যুদ্ধ” বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস এই মহা সমরের সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়স লোকান্তরগত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস সমরে নিহত হইলে, গ্রীক সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইহাই “দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন” বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রীক সেনাপতি ও ইতিহাস লেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

প্রতাপ সিংহ স্বদেশে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুরন্ত যবন হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তাহা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই বৃত্তান্ত জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময় রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনীমধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয়, এবং নয়ন-জলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতাপ সিংহের কার্য্য-পরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোনও ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হন নাই, কোনও ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থ বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, প্রতাপের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন নাই। আরাবলী পর্ব্বতমালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপ সিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। চিরকাল এই গৌরব-স্তম্ভ উন্নত থাকিয়া, রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও ইহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রংলিহ শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না।

গোবিন্দ সিংহ।

মহামতি নানক বিবিধ ধৰ্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে অভিনব ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সে ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে যোগীর ন্যায় নিরীহ ভাবে আপনাদের ধৰ্ম্ম-শাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। কাল-ক্রমে মুসলমানদিগের অত্যাচারে এই ধৰ্ম্মাবলম্বিদিগের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, ইহাঁরা পশুর ন্যায় বধ্য ভুমিতে নীত হইতে লাগিলেন, অসামান্য অত্যাচার—অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় সকলের প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে লাগিল। এই নিদারুণ সময়ে শিখ-সমাজে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন; তিনি স্বশ্রেণীর—স্বজাতির এই অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া অধ্যবসায় ও উৎসাহ-সহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজ-স্বিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখদলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, বেদনা-বোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ শিখদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবধি মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিখগণ মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্য-সূত্রে সম্বদ্ধ করেন, গোবিন্দ সিংহের প্রতিভাবলেই হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক ভুমিতে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দ সিংহই শিখদিগের মধ্যে জাতীয় জীবনের প্রথম পরিপোষক। শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-কুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দ সিংহই তাহার মূল। তেজোবত্তা ও মহাপ্রাণতায় শিখ-গুরু-সমাজে

গোবিন্দ সিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দ সিংহের ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হইলে অঙ্গদ নামে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য শিখদিগের গুরু হন। অঙ্গদের পর অমরদাস ও রামদাস যথাক্রমে শিখ-সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। চতুর্থ গুরুর নাম অর্জ্জুনমল। এ পর্য্যন্ত যে যে গুরু শিখদিগের অধিনায়ক হন, তাঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুনেরই নানকের প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অর্জ্জুন আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক "আদিগ্রন্থ" একত্র সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধ করেন। এই সময়ে জাহাগীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে অবস্থান করিতে ছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার অনুকূলে আপনাদের ধর্ম্ম-শাসনের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে জাহাগীর তাঁহাকে দিল্লীতে আনিয়া কারাবদ্ধ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারের অসহনীয় যাতনায় অথবা ঘাতকদিগের প্রাণান্তক কুঠারাঘাতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়। অর্জ্জুনের পর তৎপুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাসীন হন। পিতার এইরূপ শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদিগের প্রতি হরগোবিন্দের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মে। এ পর্য্যন্ত শিখগণ যে নিরীহ-ভাবে কালাতিপাত করিতে ছিল, অর্জ্জুনমলের মৃত্যুতে সে নিরীহ-ভাব অপগত হয়; প্রতিহিংসা বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই দুই খানি তরবারি রাখিতেন; কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিতেন;—"একখানি পিতার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য, অপর খানি মুসলমানদিগের শাসনের উচ্ছেদ জন্য রক্ষিত

হইতেছে।" হরগোবিন্দই শিখ-সম্প্রদায়ে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক।

হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্র—গুরুদিত্য, সুরত সিংহ, তেগবাহাদুর*, অন্নরায় ও অটলরায়। ইঁহাদের মধ্যে পিতার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠটীর মৃত্যু হয়। শেষ দুই জন অপুত্রক অবস্থায় পরলোক-গত হন, এবং অবশিষ্ট দুই জন মুসলমানদিগের অত্যাচারে পঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদিত্যের দাহিরমল ও হররায় নামে দুই পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টী হরগোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দুই পুত্র রামরায় ও হরেকৃষ্ণের মধ্যে গুরুর পদ লইয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ হয়। কোন প্রকারে এই গোলযোগের মীমাংসা না হওয়াতে উভয় পক্ষ দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট্ অওরঙ্গজেব শিখদিগকে আপনাদের গুরু নির্ব্বাচন করিয়া লইতে অনুমতি দেন। এই অনুমতিক্রমে শিখগণ হরেকৃষ্ণকে আপনাদের গুরুর পদে বরণ করে। কিন্তু দিল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বেই ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রোগে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হয়, তদীয় খুল্লপিতামহ তেগবাহাদুর শিখদিগের অধিনায়ক হন। এই তেগবাহাদুর গোবিন্দ সিংহের পিতা। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা নগরে গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়।

হরগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাদুরও কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন তেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্র-ধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। যাহা হউক, তেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া কারা-

* তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। তরবারির অধিস্বামীকে তেগবাহাদুর বলা যাইতে পারে।

রুদ্ধ হন। কারাগারে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়, পরিশেষে তিনি জয়পুর-রাজ জয়সিংহের বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া কিয়ৎকাল আসাম, পাটনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পঞ্জাবে উপনীত হন। পঞ্জাবে প্রত্যাগত হইলে তেগবাহাদুর পুনর্ব্বার দিল্লীশ্বরের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠেন, অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়, তেগবাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে, অওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে যাইবার সময়ে তেগবাহাদুর স্বীয় তনয় গোবিন্দকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ পূর্ব্বক এই কথা বলেন, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ যেন শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়। গোবিন্দ পিতার এই শেষ আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হন। তেগবাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। এই স্থানে ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘাতকদিগের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। ধর্ম্মান্ধ অওরঙ্গজেব নিহত গুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করেন।

যখন তেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পনর বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দ সিংহের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, যবন-বিনাশ ও যবন-হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে এক ভূমিতে আনিয়া একটী মহাসম্প্রদায়ে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসন-কর্ত্তৃগণের সাবধানতা প্রযুক্ত গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে

সমর্থ হন নাই। যাহা হউক, তিনি এক জন নীচজাতীয় লোক দ্বারা পিতার শব আনয়ন পুর্ব্বক প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া যমুনার তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করেন। এই স্থানে মৃগয়ায়, পারস্থ ভাষা অধ্যয়নে ও স্বজাতির গৌরব-কাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়।

মোগল-সাম্রাজ্য অওরঙ্গজেবের সময়েই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। অওরঙ্গজেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটী পরাক্রান্ত রাজ্য পুর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, অওরঙ্গ-জেবের সমকালে তাহা নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল ও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। এক দিকে প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুত-রাজ্য ক্ষীণতেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে নব অভ্যুদিত মহারাষ্ট্র-রাজ্য মস্তক-শূন্য হইয়া পড়ে। অওরঙ্গজেবের সময়ে শিবজীই কেবল স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে অওরঙ্গজেবের রাজত্ব অনেকাংশে নিষ্কণ্টক ও নিরুদ্বেগ হয়। শিবজীর অত্যয়ে অওরঙ্গজেবের প্রতাপ প্রায় সকলেরই ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগলসাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময় গোবিন্দ সিংহ শিখ-দিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় বিংশতি বর্ষ যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পাঞ্জাবে আগমন পুর্ব্বক এই শিষ্য-দল লইয়া জীবনের মহদ্‌ব্রত সাধনে সমুদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভুয়োদর্শন তাঁহার বিচার-শক্তি মার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল; এক্ষণে একতা ও স্বার্থ-ত্যাগ

তাঁহার বীজমন্ত্র হইল, তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে নূতন তেজ, নূতন সাহসের সঞ্চার করিলেন। তাঁহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল। গোবিন্দ এই রূপে প্রবল-পরাক্রম রাজত্বে বাস করিয়া, সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং বদ্ধমূল হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়-ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সেই ধর্ম্মানুশাসনেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন, এবং বিধর্ম্মীর অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি সাধনা-বলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইচ্ছার একাগ্রতা ও হৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদন জন্য এক্ষণে প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও যোদ্ধৃবর্গের কার্য্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহার কল্পনা পৃথিবীর শিক্ষাপথ পরিস্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকিত, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে সচেষ্ট থাকিত। তিনি শিষ্যদিগকে মহাসত্ত্ব করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভুতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন। দেবতাগণ কি প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া, দৈত্যগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধগণ কি প্রকারে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কি প্রকারে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট ও কিরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া, লোকের মনের উপর আধিপত্য

বিস্তার করিরাছেন, ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিতেন; তিনি কহিতেন, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন, এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাসত্ত্ব হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্নপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিতেন, যত্নপূর্ব্বক বৈদিক তত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতা লাভের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। কথিত আছে, তিনি নইনা পর্ব্বতে যাইয়া অর্জ্জুনের বীর্য্য, অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্মসংযম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তায় শিখ-সমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ এক্ষণে নূতন পদ্ধতিতে শিখ-সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, কোনরূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরল হৃদয়ে ও একান্ত মনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই এক-প্রাণ ও একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর, সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পঙ্ক্তিতে, এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে, এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ

ইহা কহিয়া স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিন জন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে খাল্‌সা* বলিয়া সম্বোধন করিলেন ; এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়সূচক 'সিংহ' উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতি-গত পার্থক্য দূর করিয়া সকলকেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিলেন, এবং সকলের হৃদয়ে নূতন জীবনী শক্তি ও নূতন তেজের সঞ্চার করিলেন। জাতি-ভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বর-বাদী হইয়া আদি গুরু নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, রাজপুতদিগের ন্যায় সিংহ উপাধিতে বিশেষিত হইয়া দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল, এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, প্রকৃত যোদ্ধার পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল†। "ওয়া! গুরুজি কা খাল্‌সা! ওয়া! গুরুজি কি ফতে!" (গুরু কৃতকার্য্য হউন,

---

* আরব্য ভাষা হইতে "খাল্‌সা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ, পবিত্র, বিমুক্ত। ভূপতির যে ভূমির সহিত তাঁহার করদ বা আশ্রিতভূম্যধিকারীর ভূমির কোনও সংস্রব নাই, সচরাচর সে ভূমিকে খাল্‌সা বলা যায়। গুরু গোবিন্দ হইতেই শিখদিগের সংজ্ঞা "খাল্‌সা" ও উপাধি "সিংহ" হয়।

† গোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত আকালী নামক শিখসম্প্রদায় অদ্যাপি নীলবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে।

জয়-শ্রী তাঁহাকে শোভিত করুক) তাহাদের সম্ভাষণ-বাক্য হইল। গোবিন্দ সিংহ গুরুমঠ নামে একটী শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখ-শাসন অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপে শিখগণ যাহাতে একপ্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণবিশিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দ সিংহ এই রূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া নূতন শিখ-সমাজ সংগঠিত করিলেন, এবং এইরূপে ধীরে ধীরে নব অভ্যুদিত শিখ-সমাজে রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, সংযত-চিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহ ভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারাই এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্র-সমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ জীবনের এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খাল্‌সাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ সিংহ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃ-সমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, পিতৃ-হন্তা অত্যাচারী যবনদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগল-শাসন বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল-সাম্রাজ্য প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত

থাকিত। মোগল-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় সের শাহের পরাক্রমে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোড়শ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। আকবর যদিও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতা-প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ ভারত-বর্ষে আধিপত্য করেন, যদিও তাঁহার বিচক্ষণতায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিবৈর অনেকাংশে তিরোহিত হয়, তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সেলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। শাহ জহান জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া তনয়দিগকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে ইহাঁদিগের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন অওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার কঠোর রাজনীতিতে অনেকেই তৎপ্রতি বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। আকবর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে যে যত্ন করেন, সে যত্ন অওরঙ্গজেবের রাজ্য হইতে সর্ব্বাংশে দূরীভূত হয়। অওরঙ্গজেব নিজের সন্দিগ্ধতা, ধর্ম্মান্ধতা ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে দুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, অপর দিকে শিবজী বিধর্ম্মীর শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ পুনর্ব্বার এই তেজের উৎপত্তি করিয়া জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। তেজস্বী শিখ-গুরুর এই অভ্যুত্থান অসাময়িক বা হঠকারিতা-জনক বিবেচিত হইবে না।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় কৃতকার্য্য হইবার জন্য

আপনার শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া এক এক দল শিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও উন্নত শিষ্যগণের উপর এই সৈন্য-দলের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-সমূহের পাদদেশে তিনটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। নাহনের নিকটবর্ত্তী পবন্ত নামক স্থানে তাঁহার একটী সেনা-নিবাস ছিল; এই সেনা-নিবাস ব্যতীত তাঁহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আনন্দপুর-মাখোয়ালে আর একটী আশ্রয়-স্থান করায়ত্ত হইল। গোবিন্দ সিংহের তৃতীয় আশ্রয়-স্থান চম্পকুমার; ইহা শতদ্রুর তটে অবস্থিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করা সুবিধা-জনক ভাবিয়া, গোবিন্দ সিংহ অগ্রে এই দুর্গ ও আশ্রয়-স্থান সমূহ সুব্যবস্থিত করিলেন, পরে পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্দ্দারদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ বিধর্ম্মী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে সমাসীন হইয়া, সেনা-নিবাস নিরাপদ করিতে ও দুর্গ সমূহের শৃঙ্খলা বিধানে যত্নপর হইলেন।

নাহনের সর্দ্দারের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম যুদ্ধ হয়। গোবিন্দের সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, বেতন বাকি পড়াতে তাহারা গোবিন্দ সিংহের সম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে। এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভ হয়। শিখগুরুর এই প্রথম কৃতকার্য্যতা দর্শনে অনেকে আসিয়া গোবিন্দ সিংহের দল পরিপুষ্ট করে। ইহার কিছু কাল পরে

মিয়া খাঁ নামে একজন মোগল সর্দ্দার নাদনের রাজা ভীম-চাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নাদম-রাজ্য শ্রীনগরের উত্তর-পশ্চিমে ও জম্মুর দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। জম্মুরাজ এই যুদ্ধে মিয়া খাঁর পক্ষ অবলম্বন করাতে ভীমচাঁদ গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গোবিন্দ সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ভীম-চাঁদের সাহায্যার্থ সমর-স্থলে উপনীত হন, এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীমচাঁদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। মোগলসর্দ্দার ও জম্মু-রাজ পরাজিত হইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মিয়া খাঁর সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, কিন্তু শিখদিগের কৌশলে তাঁহা-কেও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। দিলির খাঁ পুত্রের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া, সমুদয় সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক হুসেন খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটী দুর্গ হুসেনের অধিকৃত হয়, কিন্তু শেষে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, কেবল তাঁহার অনুচরগণই বিশিষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিয়া এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার শিষ্যগণের এইরূপ পরাক্রম দর্শনে অওরঙ্গজেব চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লাহোর এবং সর্হিন্দ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন। সম্রাটের এই কঠোর আজ্ঞায় এবার যুদ্ধের সমৃদ্ধ আয়োজন হইল। ১৭০১ অব্দে দিলির খাঁ গোবিন্দের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। অওরঙ্গজেবের পুত্র মোজাইমও ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদে শিখগণের অনেকে ভীত হইয়া সন্নিহিত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে ৪০ জন সাহসী শিখ, গুরুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুরে মোগল সৈন্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন, তাঁহার মাতা ও স্ত্রী, দুইটি শিশু সন্তানের সহিত সর্হিন্দে পলায়ন করিলেন। কিন্তু পরিশেষে ঘটনাক্রমে শিশু-সন্তানদ্বয় মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া নির্দ্দয়রূপে বিনষ্ট হইল। এ দিকে গোবিন্দ সিংহ রাত্রি-কালে মোগল সৈন্যগণের অগোচরে চম্পকুমারে উপস্থিত হইলেন।

শত্রুগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে খোজা মহম্মদ ও নহর খাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই সেনাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া, এক জন দূত পাঠান। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের পুত্র অজিত সিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দেন। দূত তিরস্কৃত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অজিত সিংহ বিশিষ্ট পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ জয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অন্ধকার-রাত্রিতে চম্প-কুমার পরিত্যাগ করেন। প্রস্থান-সময়ে দুই জন পাঠান তাঁহাকে দেখিতে পায়। এই পাঠানদ্বয় পূর্ব্বে গোবিন্দ সিংহের নিকট উপ-কার পাইয়াছিল বলিয়া, এ সময়ে তাঁহার বিশিষ্ট সাহায্য করে। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে চম্পকুমার হইতে বিলোলপুর নগরে উপ-নীত হন। এই স্থানে পীর মহম্মদ নামে এক জন মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ পীর মহম্মদের সহিত এক সময়ে একত্র কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন; পীর মহম্মদ এজন্য সহাধ্যায়ীর প্রতি বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। গোবিন্দ পীর

মহম্মদের সহিত আহার পূর্ব্বক ছদ্মবেশে ভাতিণ্ডায় উপস্থিত হন। এই স্থানে শিষ্যগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হয়। গোবিন্দ এই শিষ্যদলের সাহায্যে অনুসরণ-কারী মোগলদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হানৃসী ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্ত্তী দমদমায় উপস্থিত হন। যে স্থানে গোবিন্দ সিংহ মোগল-দিগকে তাড়িত করেন, সেই স্থান অদ্যাপি "মুক্তসর" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

দমদমায় অবস্থানকালে গোবিন্দ সিংহ একখানি বিচিত্র নাটক ও একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। এই জন্য তৎপ্রণীত পুস্তক "দশম পাতসা কা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। গোবিন্দ সিংহ যে সমস্ত যুদ্ধ করেন, বিচিত্র নাটকে তৎসমুদয়ের বর্ণনা আছে; এই বর্ণনা নিতান্ত ওজস্বিনী ও হৃদয়ো-দ্দীপিনী। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ যখন এইরূপ নির্জ্জন বাসে পুস্তক-রচনা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে আপনার নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গোবিন্দ এই অনুরোধ প্রথমে রক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত ঘৃণা সহকারে কহিয়াছিলেন, তিনি সম্রাটের প্রতি কোনরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এক্ষণেও খালসাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপ-রাধের পরিশোধ লইবে। ইহার পর তিনি নানকের ধর্ম্মসংস্কার, অর্জ্জুন ও তেগবাহাদুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থার উল্লেখ করিয়া কহেন, "আমি এক্ষণে কোনরূপে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই। স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি-তেছি। সেই রাজার রাজা, অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতি-স্থল নহেন।" এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুনর্ব্বার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এ বার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হন।

কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

১৭০৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মোয়াজিম "বাহাদুর শাহ" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। বাহাদুর শাহ যখন তদীয় ভ্রাতা কামবক্সের সহিত দক্ষিণাপথে যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন গোবিন্দ সিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহূত হন। বাহাদুর গোবিন্দের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য দেখাইয়া, তাঁহাকে সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাবিধানে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি এক জন পাঠানের নিকট কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করেন। ঘোটকের মূল্যের জন্য পাঠান এক দিন গোবিন্দ সিংহকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে। গোবিন্দ এই অপমান সহিতে না পারিয়া, পাঠানকে বধ করেন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড নিহত পাঠানের পুত্রের মনে গাঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে। একদা সুযোগ পাইয়া এই পাঠান-তনয় গোবিন্দের শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দ সিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৭০৮ অব্দে গোদাবরী-তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়। মৃত্যুর সময় গোবিন্দ সিংহ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমাজের জীবন-দাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ মহাসত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ

এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ ও এক-ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া, নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সকলে এক উদ্দেশ্যে এক-সূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে, নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল; এই জন্যই তিনি হিন্দু মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রকে এক সূত্রে নিবদ্ধ করেন, এবং এই জন্যই তিনি গর্ব্ব সহকারে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকে লিখেন;— "তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান! আমার শিক্ষা-বলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখ-গুরুর এই তেজস্বি বাক্য নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার মন্ত্র-বলে চটকগণ যথার্থই শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

শিখ-সমিতিতে হরগোবিন্দ অস্ত্র-ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ সেই অস্ত্রের সহিত এমন তেজ প্রসারিত করিয়াছেন যে, তাহাতে সমস্ত শিখ-সমাজ তেজস্বী, সাহসী ও সুযোদ্ধা বলিয়া ইতিহাসের আদরণীয় হইয়াছে। হরগোবিন্দের অস্ত্র কেবল আত্মরক্ষার্থ প্রয়োজিত হইত; গোবিন্দ সিংহের অস্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষকে একপ্রাণ করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকিত, হরগোবিন্দের অস্ত্র সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া সঙ্কীর্ণ কার্য্য সাধন করিত, গোবিন্দ সিংহের অস্ত্র জাতিভেদ, বর্ণভেদ না করিয়া, বিস্তৃত সীমায় বিস্তৃত কার্য্য সাধনে প্রয়োজিত হইত। গোবিন্দ সিংহ অতি তরুণ বয়সে নিহত হন, তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে, সমস্ত

পৃথিবীর ইতিহাস বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত, গোবিন্দ সিংহ আপনার মহামন্ত্র-সাধনে প্রবৃত্ত না হইলে, শিখদিগের নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইত। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ এই অল্প বয়সে, অল্প সময়ের মধ্যে, শিখ-সমাজে যে জীবনী শক্তি ও তেজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহারই বলে, নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রামনগর ও চিলিয়ানবালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস-হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। গোবিন্দ সিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চ ভূতে মিশ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। যখন জন-কোলাহল-পূর্ণ সুশোভন নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন শত্রুর দুরধিগম্য রাজপ্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীন-পরাক্রম বৈদেশিকের বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হইবে, যখন প্রবল তরঙ্গাবর্ত্তময়ী বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্প-তোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্পতোয় গোষ্পদ ভীষণমূর্ত্তি বেগবতী নদীর আকার ধারণ পূর্ব্বক ফেন উদ্গীরণ করিয়া, অট্টহাস্যে জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের মহাপ্রাণতা, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও উদারতা অবনীতলে জাজ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের পবিত্র নাম পবিত্র জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

শিবজী।

মোগল-সাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়, আওরঙ্গজেবের কঠোর শাসনে যখন ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, সর্ব্বত্রই ভীতি ও আতঙ্ক প্রসারিত হইয়া উঠে, স্বাধীনতার প্রধান উপাসক, তেজস্বিতার অদ্বিতীয় অবলম্ব,

সাহসের একমাত্র আশ্রয় রাজপুতগণ যখন মোগলের অনুগত হন, তখন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম-শৈল-মালা-পরিবৃত পবিত্র ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি ধীরে ধীরে আপনার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, সকলের হৃদয়ে গভীর বিস্ময়ের রেখাপাত করে। ক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ইহার বিক্রমে কম্পিত হন, ক্রমে ইহা একই উৎসাহ ও তেজস্বিতার স্রোতে দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদ ভাসাইয়া দেয়। এই মহাশক্তি হিন্দু-রাজ-চক্রবর্ত্তী ভবানী-ভক্ত শিবজী।

শিবজী বীরত্বের জ্বলন্ত মূর্ত্তি—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়-ক্ষেত্র। যখন শিবজীর আবির্ভাব হয়, তখন ভারতের পূর্ব্বতন বীরত্ব-বৈভব ধীরে ধীরে সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতে-ছিল; যাঁহারা এক সময়ে সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া অনন্ত কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সন্তানগণ পরাধীনতার নিগড়ে ক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিলেন এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের আনুগত্য-স্বীকারই যেন আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন। যে তেজস্বিতার বলে পৃথ্বীরাজ পবিত্র তিরৌরী-ক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছিলেন, সমর সিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভৈরব রবে বিধর্ম্মী শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং শেষে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ দীর্ঘ কাল প্রবল-পরাক্রম, সহায়সম্পন্ন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়-লক্ষ্মীতে পরি-শোভিত হইয়াছিলেন, তখন সে তেজস্বিতা ও স্বাধীনত্ব-প্রিয়তা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল, অনৈক্য প্রযুক্ত বীর্য্যবন্ত আর্য্যপুরুষেরা ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এবং মুসলমানের পদানত হইয়া আপনাদের শোচনীয় অধঃপতনের চরম ফল ভোগ করিতেছিলেন। মহাপরাক্রম শিবজী এই অনৈক্য দূর

করেন, এবং জাতি-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া দক্ষিণাপথে একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলেন। ইহাঁর মহামন্ত্রে অজেয় মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, এবং বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুর পদানত হইয়া পড়ে।

ভারত-মানচিত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে শৈল-মালা-পরিবৃত একটি প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই প্রদেশের উত্তরে সাতপুরা পাহাড় গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছে, পশ্চিমে অপার অনন্ত সমুদ্র তরঙ্গ-লীলা বিস্তার করিয়া, জড়জগতের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে, পূর্ব্বে বরদা নদী বহিয়া যাইতেছে, এবং দক্ষিণে গোয়া নগর ও অসমতল পার্ব্বত্য ভূভাগ অবস্থিত রহিয়াছে। এই প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। ইহার পরিমাণ-ফল ১,০২,০০০ বর্গমাইল। মহারাষ্ট্র দেশ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিরবিভূষিত। ইহার অভ্যন্তরে দুরারোহ সহ্যাদ্রি উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ-শ্রেণীতে গিরিবরের অধিকাংশ সুশোভিত। যেন পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। চক্ষে না দেখিলে এই অনন্ত ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রকৃতির এই প্রিয়তম আবাস-ক্ষেত্রে, অনন্ত জগতের এই সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ভূখণ্ডে শিবজীর জন্ম হয়।

সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাপথের অনেক স্থলে মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল। বিজয়পুরের মুসলমান রাজারা বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামে এক জন মহারাষ্ট্রবাসী ব্রাহ্মণ যুবক এই বিজয়পুরের রাজ-সরকারে চাকরী করিতেন। ক্রমে বিষয়-কর্ম্মে শাহজীর ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়, ক্রমে শাহজী বিজয়পুরের অধিপতির গণনীয় কর্ম্মচারীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া উঠেন। শাহজী জিজি বাই নামে একটি মহারাষ্ট্র-রমণীর

পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজি বাইয়ের গর্ভে শাহজীর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মে ; প্রথমের নাম শম্ভুজী, দ্বিতীয়ের নাম শিবজী।

শিবজী ১৬২৭ অব্দের মে মাসে পূনার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে শিউনেরী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার বড় একটা স্নেহের পাত্র ছিলেন না। শাহজী, শিবজী অপেক্ষা শম্ভুজীকেই অধিক ভাল বাসিতেন। এজন্য তিনি শম্ভুজীকে আপনার নিকট রাখেন। শিবজী মাতার সহিত থাকেন। শিবজীর জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে শাহজী টুকা বাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্র-রমণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করাতে জিজি বাইয়ের সহিত শাহজীর বিরোধ উপস্থিত হয়, এজন্য শিবজী প্রায় ছয় বৎসর কাল পিতার দেখা পান নাই। যাহা হউক, শাহজী দাদাজী কর্ণদেব নামক এক ব্যক্তিকে শিবজী ও তদীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূনার জাইগীরের তত্ত্বাবধান জন্য নিযুক্ত করেন। দাদাজী সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জিজি বাইয়ের জন্য পূনাতে একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করেন। পূনার এই নূতন বাড়ীতে দাদাজী কর্ণদেবের তত্ত্বাবধানে শিবজীর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রবাসীরা কদাচিৎ লেখা পড়া শিখিত। লেখা পড়া শিক্ষা অপেক্ষা বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতেই তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। শিবজী নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তীর-নিক্ষেপে, তরবারি-প্রয়োগে, বড়শা-সঞ্চালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ সুনিপুণ অশ্বারোহী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবজী এ বিষয়ে স্বদেশের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব-চালনা-কৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ অপরিসীম বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাঁহার গুণ গান করিত। দাদাজী শিবজীকে

আপনাদের ধর্ম্মানুগত বিষয়ে আস্থাযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। শিবজী পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকায় তাঁহার বিশেষ সুখানুভব হইত। বাল্যকাল হইতে কথকতার উপর তাঁহার এমন শ্রদ্ধা ছিল যে, যেখানে ঐ কথকতা হইত, তিনি নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইতেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ও হিন্দুধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যে এইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবজী হিন্দু নামের গৌরব রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। শত্রুর ভ্রূকুটিপাতে, বিপদের ঘোরতর অভিঘাতে তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হন নাই। শিবজী আপনার জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নির্ভীক-হৃদয়ে অবচলিতচিত্তে এই সাধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কথায় শিবজীর তেজস্বিতা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং স্বজাতিপ্রিয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। শিবজী মোগলশাসনের মধ্যে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের কঠোর নিপীড়নের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ও চেষ্টা বিফল হয় নাই। যখন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছিল, তখন্ দক্ষিণাপথে শিবজীর ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা-ভক্ত মহাবীরের অপূর্ব্ব বীরত্বে চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিয়া-

ছিল। হিন্দু-কীর্ত্তির গৌরবে বহুদিনের পর আবার হিন্দুর পবিত্র ভূমি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শিবজী মাওয়াল নামক পার্ব্বত্য স্থানের অধিবাসী মাওয়ালী-দিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ইহারা দেখিতে সুশ্রী না হইলেও বিলক্ষণ কার্য্যপটু, সাহসী ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন ছিল। শিবজী এই মাওয়ালী সৈন্যের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থানে আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি বাল্যকালেই মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার এই মুসলমান-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি প্রায়ই কহিতেন, "আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজা হইব।" তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। শিবজী মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া স্বাধীন হিন্দু-ভূপতির সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে শিবজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইয়া উঠিলেন যে, দাদাজীর শাসন অতিক্রম করিয়াও অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতে লাগি-লেন। এইরূপে স্বদেশের দুর্গম পার্ব্বত্য পথগুলি তাঁহার পরিচিত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে অনেকগুলি গিরি-দুর্গ ছিল। শিবজী কৌশলক্রমে এই গিরি-দুর্গের অনেকগুলিতে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দুর্গগুলি বিজয়পুরের অধিপতির অধিকৃত ছিল। শিবজী উহা অধিকার করাতে বিজয়পুরের রাজার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। আফজল্ খাঁ বিজয়পুরের সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শিবজী এই সময়ে প্রতাপগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই স্থানে থাকিয়া আফজল্ খাঁকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইল না। সুসময়

সম্মুখবর্ত্তী হইল, সুসময়ে শিবজী বিজয়পুরের সৈন্যের সম্মুখে প্রাধান্য স্থাপন করিতে কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। তিনি আফজল্ খাঁকে জানাইলেন যে, বিজয়পুরের অধিপতির ন্যায় ক্ষমতাশালী লোকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। তিনি আপনার ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। যদি আফজল্ খাঁ দয়া করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে তিনি নিজের অধিকৃত প্রদেশ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

শিবজীর এইরূপ অবনতি-স্বীকারের কথায়, আফজল্ খাঁ সন্তুষ্ট হইলেন। জঙ্গলময় দুর্গম গিরিপ্রদেশে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হওয়া যে, কত দূর কষ্টকর, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। এখন শিবজী আপনা হইতেই তাঁহার অনুগত হইবেন, ইহা ভাবিয়া আফজল্ খাঁ অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া, পন্তজী গোপীনাথ নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রতাপগড়ে শিবজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দূত দুর্গের নিম্নস্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে, শিবজী দুর্গ হইতে নামিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পন্তজী ধীরতার সহিত শিবজীকে কহিলেন, "শাহজীর সহিত আফজল্ খাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। আফজল্ বন্ধুর পুত্রের কোনও অপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি আপনার সহিত শত্রুতা না করিয়া আপনাকে একটি জায়গীরের আধিপত্য দিতে প্রস্তুত আছেন।" শিবজী বিশেষ সৌজন্য ও বিনয়-নম্রতার সহিত আফজল্ খাঁর প্রেরিত দূতকে বলিলেন, "একটি জায়গীর পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব; আমি বিজয়পুর-ভূপতির এক জন সামান্য ভৃত্যমাত্র।" দূত শিবজীর এইরূপ শীলতা ও নম্রতা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিবজী

দূতের আবাস জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশে দূতের সহচরগণ কিছু দূরে অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদা গভীর নিশীথে শিবজী পন্তজী গোপীনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি হিন্দুজাতির পরিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মান রক্ষার জন্য সমস্ত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্মণ ও গাভীদিগকে রক্ষা করিতে, পবিত্র দেব-মন্দিরের অবমাননা-কারীদিগকে শাস্তি দিতে, এবং স্বধর্ম্ম-বিরোধী শত্রুগণের ক্ষমতার গতিরোধ করিতে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি ভবানীর আদেশে এই পবিত্র কার্য্য সাধনে ব্রতী হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং আপনার সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার আশা আছে যে, স্বজাতি ব্রাহ্মণের সহিত আমি পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব।" শিবজী ধীরগম্ভীরভাবে ইহা কহিয়া পন্তজীকে এক-খানি গ্রাম ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পন্তজী এই তরুণ-বয়স্ক হিন্দু-বীরের অসীম সাহস, অলোকসাধারণ দেবভক্তি ও অপরিমেয় স্বদেশ-হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইলেন। আর তাঁহার মুখ হইতে শিবজীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বাহির হইল না। তিনি ধীরভাবে শিবজীর কার্য্য সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন শিবজীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শিবজীর আশা ফলবতী হইল। পন্তজী গোপী-নাথ শিবজীর সাহস, স্বদেশভক্তি ও বাক্‌চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া, তাঁহার চিরসহচরের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

পন্তজী গোপীনাথের পরামর্শে আফজল্ খাঁ শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। শিবজী প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে একটি স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন।

তিনি এই স্থানের জঙ্গল কাটিয়া আফজল্ খাঁর আসিবার পথ পরিষ্কার করাইলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জঙ্গল পূর্ব্বের ন্যায় রহিল। শিবজী এই জঙ্গলে আপনার সাহসী মাওয়ালী সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। বিজয়পুরের সৈন্যগণ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আফজল্ খাঁ শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি যুদ্ধবেশে সজ্জিত ছিলেন না; তাঁহার পরিচ্ছদ মোটা মস্‌লিনের ছিল। পার্শ্বদেশে কেবল একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। পনর শত সৈন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু পন্তজী গোপীনাথের পরামর্শে এই সকল সৈন্য প্রতাপগড় দুর্গের কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আফজল্ খাঁ কেবল এক জন মাত্র সশস্ত্র সৈন্য লইয়া পাল্কীতে শিবজীর নির্দ্দিষ্ট গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে শিবজী আপনার অভীষ্ট কার্য্য-সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ লৌহ-বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল। এই বর্ম্মে বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্র-নখ * সন্নিবেশিত রহিল। অপরে না জানিতে পারে, এজন্য তিনি বর্ম্মের উপর পরিষ্কৃত কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া শিবজী ধীরে ধীরে দুর্গ হইতে নামিয়া যথোচিত শীলতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে আফজল্ খাঁর সমীপবর্ত্তী হইলেন। আফজল্ খাঁর ন্যায় তাঁহার সঙ্গেও এক জন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথারীতি অভিবাদনের পর শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। অকস্মাৎ আফজল্ খাঁর ভাবান্তর হইল। অকস্মাৎ আফজল্ খাঁ "ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আলিঙ্গন-সময়ে শিবজী

* বৃশ্চিক, বৃশ্চিক-সদৃশ বক্র অস্ত্র। ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রনখের আকার অস্ত্র।

আফজল্ খাঁর উদরে বাঘনখ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। যাতনায় অধীর হইয়া আফজল্ খাঁ শিবজীকে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু শিবজীর কার্পাস-বস্ত্রের নিম্নে লৌহ-বর্ম্ম থাকাতে এই আঘাতে কোন ফল হইল না। এই সকল কার্য্য নিমেষ মধ্যে ঘটিল। নিমেষ মধ্যে শিবজী অস্ত্রচালনা করিয়া আফজল্ খাঁকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন। আফজল্ খাঁর অনুচর ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। সে অবিচলিত ধীরতা ও প্রভূত সাহস সহকারে প্রভুহন্তা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনুচর এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তাহারও পতন হইল। এই অবসরে পাল্কী-বাহকেরা আফজল্ খাঁকে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের এই উদ্যম সফল হইল না। শিবজীর কয়েক জন সৈন্য হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আফজল্ খাঁর শিরশ্ছেদপূর্ব্বক ছিন্নমস্তক প্রতাপগড়ে লইয়া গেল। এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মাও-য়ালীগণ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একেবারে চারি দিক্ হইতে বিজয়পুরের সৈন্য আক্রমণ করিল। বিপক্ষগণ ইহাদের পরা-ক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিল। শিবজী বিজয়ী হইলেন। মহারাষ্ট্র-চক্রে তাঁহার অপরিসীম প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল। তিনি অবিলম্বে বহু সৈন্য ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

যাঁহারা সরল-হৃদয়, জীবনের প্রতিকার্য্যে যাঁহারা আপনাদের সরলতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা এই কার্য্যে শিবজীকে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড বলিয়া ধিক্কার দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্দ্দান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যত হইয়া থাকেন, স্বদেশদ্রোহীর মধ্যে স্বতন্ত্র রাজত্ব ... তাঁহারা অন্য ভাবে এ বিষয়ের

বিচার করিবেন। মুসলমানের চাতুরীবলে ভারতের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে। যখন মহাবীর পৃথ্বীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া দৃশদ্বতীর তীরে সমাগত হন, তখন দুরন্ত সাহাবদ্দীন গোরী তাঁহার অলোক-সাধারণ তেজস্বিতা ও প্রভূত সৈন্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এই সাহাবদ্দীন চাতুরী অবলম্বন করিয়া ঘোর রাত্রিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর অজ্ঞাতসারে হিন্দুসৈন্য আক্রমণ না করিলে, সহসা পৃথ্বীরাজের পতন হইত না, এবং সহসা অনন্ত অতল জলে ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন ডুবিত না। যাহারা এইরূপ চাতুরী—এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের সহিত সেইরূপ চাতুরী না করিলে যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, ইহা শিবজী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, চতুরের সহিত চাতুরী ও শঠের সহিত শঠতা না করিলে, তিনি কিছুতেই মুসলমান-সাম্রাজ্য অধঃকৃত করিয়া হিন্দুরাজ্যের গৌরব স্থাপন করিতে পারিবেন না। যে দস্যু অগোচরে, অজ্ঞাতসারে আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়াছে, তাহার নিকট সরল ভাবের পরিচয় দিলে কখনই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। শিবজী বাল্যকাল হইতেই এই নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই নীতি-শিক্ষা-বলেই তিনি অভীষ্ট মন্ত্রসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষিতায় উদ্দীপ্ত হইয়া দুরন্ত চতুর শত্রুর ঘোরতর অত্যাচারের গতিরোধে উদ্যত হন, তাঁহাদের নিকট শিবজীর এই শিক্ষার ফল কখনও অনাদৃত হইবে না।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূখণ্ড কঙ্কণ নামে পরিচিত। বিজয়পুরের সৈন্যের পরাজয়ের পর কঙ্কণপ্রদেশের অধিকাংশ শিবজীর হস্তগত হয়। ইহার পর শিবজী কঙ্কণের পানেলা দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হন। এই দুর্গ বিজয়পুরের অধিপতির

অধিকৃত ও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবজী পানেলা দুর্গ অধিকারেও অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি আপনার কতিপয় প্রধান সেনা-নায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া, ছলপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবাদ করেন। ইহাতে সেনা-নায়কগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই যেন, আট শত সৈন্যের সহিত শিবজীর চাকরী পরিত্যাগ করিয়া পানেলা দুর্গাধ্যক্ষের নিকট উপনীত হন। দুর্গাধ্যক্ষ ইহাঁদের কৌশল বুঝিতে পারিলেন না; শিবজীর সহিত ইহাঁদের অসদ্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, হৃষ্টচিত্তে ইহাঁদিগকে দুর্গে স্থান দিলেন। এ দিকে শিবজী অবিলম্বে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গপ্রাচীরের সমান উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ প্রাচীরের সম্মুখে ছিল। শিবজীর যে সকল সর্দ্দার দুর্গে স্থান পাইয়াছিলেন, একদা রাত্রিকালে তাঁহারা এই সকল বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহির হইতে শিবজী ও তাঁহার অনুচরদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, দুর্গ-দ্বার খুলিয়া দিলেন। দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জয়লাভে শিবজীর এত দূর প্রতিপত্তি হইল যে, নানা স্থান হইতে হিন্দু সৈনিক পুরুষেরা আসিয়া তাঁহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। বলবৃদ্ধির সহিত শিবজী অধিকতর সাহসিক কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ মুসলমান ভূপতির অধিকৃত নানা জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাদের উদ্যম, সাহস ও তেজস্বিতা বিচলিত হইল না। ইহারা দেখিতে দেখিতে বিজয়পুর নগরের প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

বিজয়পুর-ভূপতি ক্রুদ্ধ হইল, বশ্যতাস্বীকারের জন্য শিবজীর নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত শিবজীর নিকট উপস্থিত হইল। শিবজী ধীরগম্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন, "দূত! আমার উপর

তোমার প্রভুর এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইব। শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।” দূত চলিয়া গেল। বিজয়পুরের অধিপতি শিবজীর এই উদ্ধতভাবের জন্য অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, শাহজীকে কারারুদ্ধ করিয়া কহিলেন, “তোমার পুত্র শীঘ্র বশীভূত না হইলে, এই কারাগারের দ্বার গাঁথিয়া, তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।” পিতার কারারোধের সংবাদে শিবজী কিছু শঙ্কিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য-বিমুখ হইলেন না। কয়েক বৎসর পরে বিজয়পুর-রাজ শাহজীকে ছাড়িয়া দিলেন। বিমুক্ত হইয়া শাহজী, রায়গড়ে আপনার এই দুরদৃষ্টের মূল—তনয়ের কাছে গেলেন। শিবজী, পিতার সমুচিত সম্মান করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি পিতাকে গদিতে বসাইয়া, তাঁহার পাদুকা গ্রহণ পূর্ব্বক সামান্য ভৃত্যের ন্যায় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর শিবজী কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

শাহজী বিমুক্ত হইলে, শিবজী পুনর্ব্বার আপনার আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এবার বিজয়পুর-রাজ শিবজীকে পরাজিত করিবার জন্য বহুসংখ্য সৈন্য পাঠাইলেন। এক জন রণদক্ষ আবিসিনীয় সর্দ্দার এই সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন। বিজয়পুরের সৈন্য শিবজীকে পানেলা দুর্গে অবরোধ করিল। কিন্তু এ বারেও শিবজীর জয় হইল। তাঁহার কৌশলে আবিসিনীয় সর্দ্দারের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিজয়পুর-ভূপতি অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া, এই সর্দ্দারের প্রাণদণ্ড করিলেন।

যখন আওরঙ্গজেব তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন তিনি শিবজীর নিকট কয়েক-জন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার পাঠাইয়া, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু শিবজী আওরঙ্গজেবের এই ন্যায়-বহির্ভূক্ত কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই, তাঁহার প্রার্থনাও গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক হন নাই। তিনি আওরঙ্গজেবের গর্হিত প্রস্তাব শুনিয়া, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত দূতকে বিদায় দেন এবং দূত আও-রঙ্গজেবের যে পত্র আনিয়াছিলেন, তাহা ঘৃণা ও বিরাগের সহিত, কুকুরের লাঙ্গূলে বান্ধিয়া দিতে অনুমতি করেন। এই অবধি শিবজীর উপর আওরঙ্গজেবের প্রগাঢ় বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এই অবধি আওরঙ্গজেব শিবজীকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া অভিহিত করিয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হন।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এ দিকে শিবজীর সহিত বিজয়পুর-রাজের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে শিবজী সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য হইয়া-ছিল।

বিজয়পুর-রাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর শিবজী মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশে তদীয় সেনাপতিগণ দিল্লীশ্বরের অধিকার বিলুণ্ঠন করিয়া, পুনায় ফিরিয়া আসিলেন। শায়েস্তা খাঁ এই সময়ে দক্ষিণাপথের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব শিবজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশ অনুসারে শায়েস্তা খাঁ বহু সৈন্য লইয়া আওরঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। শিবজী মোগল সৈন্যের আগমন-সংবাদ শুনিয়া, রায়গড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁ পুনা অধিকার করিয়া, দাদাজী কর্ণ-দেব যে গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই গৃহে বাস করিতে

লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁ শিবজীর কৌশলের কথা জানিতেন। এজন্য সাবধানে আপনার আবাস-গৃহ সুরক্ষিত রাখিলেন। তাঁহার অনুমতি-পত্র ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় পূনায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু মোগল শাসন-কর্ত্তার এ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না। চতুর শিবজীর সাহসে ও কৌশলে সতর্ক মোগলের সর্ব্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইল।

একদা রাত্রিকালে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পূনার পথ ঘাট, প্রাসাদ, সমস্তই যেন গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও জনসমাগম নাই, কেবল এক দল বিবাহ-যাত্রী রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে পূনার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সাহসী শিবজী এই সুযোগে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেনান্নিবেশ করিয়া, স্বয়ং কেবল পঁচিশ জন অনুচরের সহিত সেই বিবাহযাত্রীর দলে মিশিলেন। বরযাত্রীর দল আমোদ করিতে করিতে পূনায় প্রবেশ করিল, শিবজীও তাহা-দের সঙ্গে মিলিয়া, পূনায় উপনীত হইয়া একবারে আপনার বাস-ভবনে পঁহুছিলেন। শায়েস্তা খাঁ নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের কয়েকটি স্ত্রীলোক, এই আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে জাগাইয়া দিল। শায়েস্তা খাঁ শয়ন-গৃহের গবাক্ষ দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন। এই সময় আক্রমণ-কারীগণের তরবারির আঘাতে তাঁহার হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি কোন প্রকারে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও অনুচরগণ, সকলে নিহত হইল। শিবজী জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, বহুল মশালের আলোকে যাই-বার পথ উদ্দীপ্ত করিয়া, পুনর্ব্বার সিংহগড়ে ফিরিয়া গেলেন।

সমস্ত মহারাষ্ট্রে মহাবীর শিবজীর এই বীরত্ব-কীর্ত্তি উদ্-ঘোষিত হইল। সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসী স্বদেশীয় মহাবীরের এই

অপূর্ব্ব বীরত্বে বিভোর হইয়া, তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিল। বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, বহু বৎসর অতীত কালের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবজীর এই সাহস ও বীরত্বের কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা আজ পর্য্যন্ত আহ্লাদের সহিত শিবজীর এই সাহস ও বীরত্বের কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি মোগল অশ্বারোহী সিংহ-গড়ের অভিমুখে আসিল। শিবজী ইহাদিগকে দুর্গের নিকট আসিতে অনুমতি দিলেন। ইহারা মহাবিক্রমে রণডঙ্কা-ধ্বনির সহিত নিষ্কোশিত তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইল। তখন শিবজী ইহাদের সম্মুখে কামান স্থাপিত করিলেন। ইহারা তোপের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না, সন্ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেল। শিবজীর এক জন সেনাপতি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। এই প্রথম বার মোগল সৈন্য শিবজীর সৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত ও তাড়িত হইল। শিবজী আপনার অপূর্ব্ব বীরত্ব-বলে বিজয়ী হইয়া দক্ষিণাপথে আত্ম-প্রাধান্য অব্যাহত রাখিলেন।

ইহার পর শিবজী অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অধিকৃত সুরাট নগর লুণ্ঠন করিয়া, অনেক অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি জলপথেও আধিপত্য স্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি রণতরী ছিল। এই সকল রণতরী দ্বারা মোগল সম্রাটের রণতরী অধিকৃত হইল।

শিবজী সুরাট লুণ্ঠন করিয়া আসিয়া, শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতৃবিয়োগে শিবজী সিংহগড়ে আসিয়া, শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া, আপনার প্রধান অমাত্যগণের সহিত অধিকৃত জনপদের শাসন-প্রণালীর সুন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে কয়েক মাস

অতিবাহিত হইল। এই সময়ে শিবজী "রাজা" উপাধি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। মোগল সাম্রাজ্যের মহাপ্রতাপের মধ্যে ভারতের মহাবীর স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়া, স্বাধীনভাবে শাসন-দণ্ড-পরিচালনায় উদ্যত হইলেন।

মক্কা-যাত্রীগণ সুরাট বন্দরে আসিয়া জাহাজে উঠিত। এজন্য মুসলমানগণের মধ্যে সুরাট একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই পবিত্র স্থান বিলুণ্ঠন ও শিবজীর "রাজা" উপাধি-গ্রহণ-সংবাদে আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দমন জন্য রাজা জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে পাঠাইলেন। কিন্তু শিবজী ইহাঁদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রথমে রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রীকে জয়-সিংহের নিকট পাঠাইলেন। জয়সিংহের সহিত দূতের অনেক কথা হইল। দূত বিদায় লইয়া শিবজীর নিকট আসিলেন। শিবজী বীর-ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যল্প অনুচরের সহিত বর্ষার প্রারম্ভে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য এক জন সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাইলেন। শিবজী শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইলে জয়সিংহ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনার আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া, দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সম্রাট সমস্তই অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর শিবজী মোগলের পক্ষ হইয়া, বিজয়পুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী বৎসর তিনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার পুত্র, পাঁচ শত অশ্বারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করেন।

শিবজী দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু আওরঙ্গজেব দুর্ম্মতি-প্রযুক্ত এই পরাক্রান্ত হিন্দুভূপতির যথোচিত সম্মান করিলেন না। তিনি শিবজীকে আপনাদের প্রজাগণের সমক্ষে অপদস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিবজী সম্রাটের সভাগৃহে সমাগত হইলে আওরঙ্গজেব আদর না করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের আসনে বসাইয়া দিলেন। শিবজী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সভা-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না। সম্রাট তাঁহার বাসগৃহে প্রহরী রাখিতে নগরের কোতোয়ালকে বলিয়া দিলেন। এ দিকে চতুর মহারাষ্ট্রপতি, দিল্লীর জলবায়ু সমভিব্যাহারী লোকের সহ্য হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট অনুমতি চাহিলেন। সঙ্গের লোক চলিয়া গেলে শিবজী সহায়বিহীন, সুতরাং তাঁহার আয়ত্ত হইবেন ভাবিয়া, সম্রাট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ইহার পর শিবজী পীড়ার ভাণ করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। অনন্তর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে, এই কথা ঘোষণা করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ ঝুড়িতে করিয়া ফকীর সন্ন্যাসীদিগকে মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার আবাস-গৃহ হইতে মিষ্টান্নপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ি বাহির হইতে লাগিল। যখন প্রহরীদিগের সংস্কার জন্মিল যে, ঝুড়িতে কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন সন্ধ্যার সময় শিবজী এক ঝুড়িতে নিজে চড়িয়া এবং আর একটিতে তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে চড়াইয়া বাস-ভবন হইতে বাহির হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব সজ্জিত ছিল। শিবজী সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনার পশ্চাদ্ভাগে শম্ভুজীকে রাখিয়া তৎপরদিন মথুরায় উপনীত হইলেন। এইখানে কতিপয় বন্ধুর নিকট শম্ভুজীকে রাখিয়া

স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথে আসিলেন। ইহার পর তাঁহার বন্ধুগণও শম্ভুজীকে লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন।

এই সময়ে বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। পাছে শিবজী বিজয়পুর-রাজের সহিত মিলিত হন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব তাঁহাকে এক জাইগীর দিয়া "রাজা" উপাধি দৃঢ়তর করিলেন। ইহার পর শিবজী বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন।

কিছু দিনের জন্য যুদ্ধের বিরাম হইলে শিবজী নিজ রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করেন। তিনি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন; কৃষকদিগের উপর দৌরাত্ম্য না হয়, কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পারে, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে যাইত। শিবজী আপনার কর্ম্মচারী দ্বারা এই রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সৈন্যদিগকে রাজ-কোষ হইতে বেতন দিবার নিয়ম করেন। তাঁহার পদাতিক সৈন্যের অধিকাংশই মাওয়ালীজাতীয়। তরবারি, ঢাল ও বন্দুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহারা মাসে ৩।৪ টাকা হইতে ১০।১২ টাকা বেতন পাইত। অশ্বারোহী সৈন্য "বর্গী" ও "শিল্লীদার," এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বর্গীরা অশ্ব ও মাসে ৬।৭ টাকা হইতে ১৫।২০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত। শিল্লীদারেরা আপনাদের অশ্বে কাজ করিত। ইহাদের বেতন ১৮।২০ টাকা হইতে ৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। লুণ্ঠনে যাহা পাওয়া যাইত, তৎসমুদয় রাজ-কোষে জমা হইত। লুণ্ঠনকারীরা কেবল উপযুক্ত পারিতোষিক পাইত। ১০ জন সৈন্যের উপর এক জন নায়ক, ৫০ জনের উপর এক জন হাবিলদার ও

১০০ জনের উপর এক জন জুম্‌লাদার থাকিত। হাজার পদাতিক সৈন্যের অধ্যক্ষকে এক-হাজারী বলা যাইত। পাঁচ-হাজারীর উপর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিতেন।

পদাতিকদিগের ন্যায় অশ্বারোহী সৈন্যেরও শ্রেণী ছিল। ২৫ জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর হাবিলদার, ১২৫ জনের উপর জুম্‌লাদার ও ৬২৫ জনের উপর সুবাদার ছিল। ৬,২৫০ জন্য অশ্বারোহীর অধ্যক্ষকে পাঁচ-হাজারী কহা যাইত। তরবারি, ঢাল ও বড়শা অশ্বারোহীদিগের প্রধান অস্ত্র ছিল। ইহাদের অশ্বগুলি ক্ষুদ্রাবয়ব ও দ্রুতগামী হওয়াতে ইহারা অনায়াসে ত্বরিত গতিতে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমন করিতে পারিত।

হিন্দুদিগের মতে শরৎকালই দিগ্বিজয়-যাত্রার সময়। প্রতাপশালী শিবজী এই সময়ে আড়ম্বরসহকারে দশভুজা দুর্গার পূজা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। শিবজী শত্রুদিগের অধ্যুষিত জনপদ লুণ্ঠন করিতেন বটে, কিন্তু কৃষক, গো অথবা স্ত্রীলোকদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। এইরূপ পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের উপর মহারাষ্ট্ররাজ্য স্থাপিত হয়, এবং এইরূপে মরহাট্টাগণ, সাধারণের নিকট একটি প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে।

আওরঙ্গজেব বাহিরে সৌজন্য দেখাইয়া, শিবজীকে আর একবার হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শিবজী আওরঙ্গজেবের কৌশলজালে জড়িত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণাপথের নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুতরাং মোগল সম্রাট্‌কে এখন বাধ্য হইয়া শিবজীর সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শিবজী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলের আনুগত্য

স্বীকার করিলেন না। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় আপনার বীরধর্ম্ম রক্ষায় যত্নশীল হইলেন। অবিলম্বে মোগল সম্রাটের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গে বিজয়-পতাকা স্থাপিত হইল। শিবজী ইহার পর পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আর এক বার সুরাট নগরে উপনীত হইলেন। তিন দিন ধরিয়া নগর বিলুণ্ঠিত হইল। কেহই তেজস্বী মহারাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না। শিবজী অবাধে সুরাটের ধনসম্পত্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

শিবজী যখন সুরাট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন দায়ুদ খাঁ নামক এক জন মোগল সেনাপতি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। শিবজী দায়ুদ খাঁকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এ দিকে তাঁহার সেনাপতি প্রতাপ রাও খান্দেশ প্রদেশে যাইয়া, নানা স্থান হইতে কর সংগ্রহ করিতে থাকেন। শিবজীর এইরূপ প্রভাব ও আধিপত্যে চিন্তিত হইয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে মহব্বৎ খাঁর অধীনে চল্লিশ হাজার সৈন্য দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দেন। শিবজী এই সৈন্যের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বিমুখ হন নাই। তিনি মরোপন্ত ও প্রতাপ রাও নামক আপনার দুই জন প্রধান সেনাপতিকে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সেনাপতি-দ্বয়ের আগমন-সংবাদ শুনিয়া মহব্বৎ খাঁ, ইখলাস খাঁর অধীনে বহুসংখ্য সৈন্য ইহাঁদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২২ জন সেনানায়ক নিহত হন। কয়েক জন প্রধান সেনাপতি আহত হইয়া বন্দিত্ব স্বীকার করেন।

মোগল সৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এইটি প্রধান সম্মুখ-যুদ্ধ। এই যুদ্ধে, শিবজীর সৈন্যগণ বিজয়-লক্ষ্মীতে গৌরবান্বিত

হয়। তাহাদের বিজয়িনী শক্তির মহিমা চারি দিকে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে। শিবজী মহাপরাক্রান্ত ভূপতি বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত হন; তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার সমর-চাতুরীতে সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অলোক-সাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া মনে করিতে থাকে। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব এই পরাক্রান্ত শত্রুর অপূর্ব্ব প্রভাবে স্তম্ভিত হন। এই যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি বন্দী হইয়াছিলেন, শিবজী তাঁহাদের সহিত কোনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি বন্দীদিগকে প্রভুত সম্মানের সহিত রায়গড়ে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের ক্ষত স্থান ভাল হইলে প্রভুত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। ভারতের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ পবিত্র বীর-ধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই। আহত বন্দীগণকে রায়গড়ে কখনও কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিবজীর আদেশে ইহাঁদের যথোচিত সুশ্রূষা হইয়াছিল। পতিত শত্রুর প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে শিবজী প্রকৃত বীরোচিত মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহত্ত্ব ও এই উদারতা অনন্তকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে।

শিবজী পূর্ব্বেই রাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। অভিষেক-কার্য্য সম্পাদনের জন্য গঙ্গাভট্ট নামক এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দের ৬ই জুন প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র দিনের মধ্যে পরিগণিত। এই পবিত্র দিনে দুরারোহ শৈল-শিখরবর্ত্তী রায়গড়ে মহারাজ শিবজী স্বাধীন হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তীর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন। শাস্ত্র-পারদর্শী

গঙ্গাভট্ট এই পবিত্র দিনে শিবজীকে যথাশাস্ত্র রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে অনেক ধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, মহোল্লাসের তরঙ্গে রায়গড়ে অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিকাশ হয়। বহু দিনের পর স্বাধীনতাভক্ত হিন্দু বীর-গণের পবিত্র জয়-ধ্বনিতে রায়গড় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মহাবীর শিবজী রাজ-বেশে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক এই পবিত্র দিনের স্মরণার্থ একটি অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং রাজ্যসম্পর্কীয় উপাধি সকল পারস্য নামের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত নামে অভিহিত করিতে আদেশ দেন। এইরূপে শিবজীর অভিষেক-কার্য্য সম্পা-দিত হয়। এইরূপে এই শেষ বার পরাধীন পর-পীড়িত ভার-তের হিন্দু বীর আপনার অসাধারণ বীরত্ববলে দুরন্ত শত্রুর মধ্যে রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার মহিমায় গৌরবান্বিত হন।

শিবজী রাজপদবী গ্রহণ করিয়া, যথানিয়মে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তিনি এই বিস্তৃত রাজ্য-শাসনে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। যুদ্ধজয়ে ও রাজ্যাধি-কারে তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ও কৌশল প্রকাশিত হয়, তিনি অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানেও সেইরূপ ক্ষমতা ও কৌশলের পরিচয় দেন। শিবজী ইহার পরেও, নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেও তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যগণ এক সময়ে নর্ম্মদা নদী পার হইয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যখন মোগল সেনানী দিলীর খাঁ বিজয়পুরের অধি-পতিকে আক্রমণ করেন, তখন বিজয়পুর-রাজ শিবজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবজী এই সাহায্যদানে অসম্মত হন নাই। তাঁহার সমর-চাতুরীতে দিলীর খাঁ এমনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া

উঠেন যে, তাঁহাকে অগত্যা বিজয়পুর পরিত্যাগ করিতে হয়। বিজয়পুররাজ এজন্য ভূসম্পত্তি দিয়া শিবজীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এইরূপে নানা স্থানে নানা বিষয়ে আপনার অসামান্য সাহস, অপরিমেয় ক্ষমতা ও অবিচলিত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, মহাবীর শিবজী ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হন। তাঁহার হাঁটু ফুলিয়া উঠাতে তিনি রায়গড়ে গমন করেন। ক্রমে প্রচণ্ড জ্বরের আবির্ভাব হয়। এই জ্বরের আর বিরাম হইল না। শিবজী জ্বরারম্ভের সপ্তম দিবসে ১৬৮০ অব্দের ৫ই এপ্রেল ৫৩ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে অসাধারণ বীরপুরুষের অসাধারণ ঘটনাপূর্ণ জীবনের অবসান হইল। বীরপুরুষের সমস্ত কার্য্যই লোকাতীতভাবে পরিপূর্ণ। ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটও তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্য রোধে সমর্থ হন নাই। যখন তাঁহার মাওয়ালী সৈন্য, তাঁহার সমর-পটুতা, তাঁহার সাহস ও তাঁহার রাজ্য-শাসনের কথা মনে হয়, তখন তাঁহার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে, বন্ধুজনের অনভিমতে নিঃসহায় নিরবলম্ব হইয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের সঞ্চার হয় নাই। তিনি অপূর্ব্ব ক্ষমতা ও অধ্যবসায়-বলে আপনার গুরুতর সাধনায় সুসিদ্ধ হন, এবং কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত হইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করেন।

শিবজী স্বজাতির পূর্ব্বতন গৌরবের উদ্ধারকর্ত্তা। বহুশতাব্দীর অত্যাচার ও অবিচারে যে জাতি নিপীড়িত, নিষ্পেষিত হইতেছিল, যে জাতি স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া, পরাধীনতা স্বীকারই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছিল, শিবজী সেই

জাতিকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে আনয়ন করেন, এবং ধীরে ধীরে সেই জাতির হৃদয়ে অচিন্তনীয় সাহস ও উৎসাহ প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা-ভক্ত বীরপুরুষের সম্মানিত পদে স্থাপিত করিয়া তুলেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে, তাঁহার ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে—নিপীড়নের ভয়াবহ কালে, হিন্দুর পবিত্র ভূমিতে, আর কোন হিন্দু বীরকর্ত্তৃক এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

অপরিসীম সাহস ও ক্ষমতা থাকাতে শিবজী সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার ক্ষমতায় সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে। বস্তুতঃ সাহসে, কৌশলে ও ক্ষমতায় তৎসময়ে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহাকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। কিন্তু এই পার্ব্বত্য মূষিকের ক্ষমতায় দিল্লীর প্রতাপান্বিত সম্রাট এত দূর নিপীড়িত হইয়াছিলেন যে, অগত্যা তিনি উহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আওরঙ্গজেব শিবজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া কহিয়াছিলেন, "শিবজী এক জন প্রধান সেনাপতি ছিল; যখন আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম, তখন কেবল এই ব্যক্তিই একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করে। আমার সৈন্য উনিশ বৎসর কাল তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি তাহার রাজ্যের কোন অবনতি হয় নাই।" আওরঙ্গজেবের কথাতেই শিবজীর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শিবজী শত্রুর অপকারী ছিলেন। কিন্তু যাহারা পরাজিত ও বন্দীভূত হইত, তাহাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি আত্মীয় স্বজন ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ

অসদ্ব্যবহার করিতেন না। এইরূপ সদয় ব্যবহারে সকলেই তাঁহার অনুরক্ত থাকিত। মিতাচার তাঁহার একটি গুণ ছিল। অসাধারণ ক্ষমতাবলে অপরিমিত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেও তিনি কখনও সৌখীনতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার নিকট ভোগ-বিলাসের আদর ছিল না। তিনি সামান্য বেশে ও সামান্য আহারপানে পরিতুষ্ট থাকিতেন।

শিবজী দক্ষিণাপথে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার দৈর্ঘ্য চারি শত মাইল, বিস্তার এক শত কুড়ি মাইল। তাঞ্জোরে তিনি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। নর্ম্মদা হইতে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত, কঙ্কণ হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতিগণ কোন না কোন সময়ে শিবজীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সকলেই শিবজীকে কর দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। সমগ্র দক্ষিণাপথে তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল। দক্ষতায়, একাগ্রতায়, সত্বরতায় তিনি সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার কৌশলজাল ভেদ করিতে পারিত না, কেহই তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, এবং কেহই তাঁহার ক্ষমতা রোধে সাহস পাইত না। তিনি মুসলমানদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া জানিতেন। মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যে, স্বদেশের অধঃপতন হইয়াছে, ইহা তিনি বেশ্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিশ্বাসঘাতকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন কোন সময়ে বিশ্বাসের বহির্ভূত কার্য্য করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবজী খর্ব্বকায় ছিলেন। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল সুগঠিত ও বীরত্বব্যঞ্জক ছিল। দেহের পরিমাণ অনুসারে তাঁহার বাহুযুগলের দৈর্ঘ্য অধিক বোধ হইত। তাঁহার অনুরক্ত

স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তিনি আপনার তরবারির নাম "ভবানী" রাখিয়াছিলেন। এই তরবারি সেতারার রাজার অধিকারে রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত সেতারার রাজসংসারে শিবজীর ভবানীর পূজা হইয়া থাকে।

রণজিৎ সিংহ।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতির সূত্রপাত হয়। সম্রাটের পর সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়, পদচ্যুত ও নিহত হইতে থাকেন, জনপদের পর জনপদ দিল্লীর অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিয়া স্বপ্রধান হইতে থাকে, শাসনকর্ত্তার পর শাসন-কর্ত্তা সম্রাটের আদেশে ঔদাসীন্য দেখাইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। পরাক্রান্ত নাদির শাহের আক্রমণে মোগল সম্রাটের প্রিয় নিকেতন সুশোভন দিল্লী মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হয়। ইহার পর দোর্‌রাণী ভূপতি অহম্মদ শাহ আপনার সাহসী আফগান সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে সমাগত হন। ইহাঁর পরাক্রমে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মর্‌হাট্টাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। দিল্লীর সম্রাট্ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হীনভাবে বিহার প্রদেশে উপনীত হন। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে—বিলুণ্ঠন, বিপ্লাবন ও বিধ্বংসের ভয়াবহ রাজ্যে শিখগণ আপনাদের জাতীয় তেজস্বিতা অক্ষত রাখিয়াছিল। গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা সে মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই, তাহাদের মধ্যে সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসন-কর্ত্তার আবির্ভাব হইতেছিল। তাহারা এই সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসন-

কর্ত্তার অধীনে সজ্জিত হইয়া আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিতেছিল। যাহারা অস্ত্র-চালনায় তৎপর ও অশ্বারোহণে নিপুণ না হইত, খালসাদিগের মধ্যে তাহাদের সম্মান বা প্রাধান্য থাকিত না। সুতরাং প্রত্যেক খালসাকেই অস্ত্র-সঞ্চালনে ও অশ্বারোহণে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিতে হইত। ক্রমে খাল-সারা অনেক দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দলের এক একজন সর্দ্দার এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এইরূপে সমস্ত শিখ জনপদ অনেকগুলি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া উঠে। এই সকল খণ্ড "মিসিল" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সর্ব্বাংশে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। খাল-সারা এইরূপ বহু মিসিলে বিভক্ত হইলেও পবিত্র ভ্রাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ইহাদের সকলেই পরস্পর দুশ্চ্ছেদ্য-জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতিবৎসর অমৃতসরের পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়া আপনাদের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইঙ্গরেজ বণিকেরা দক্ষিণা-পথে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা পাইতে-ছিলেন, এক জন বর্ষীয়ান্ দরিদ্র মুসলমান সৈনিক পুরুষ * মহীসুরের সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক যখন সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের গভীর রেখাপাত করিতেছিলেন, তখন শিখদিগের খণ্ড রাজ্যে এক জন ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল বীরপুরুষের আবি-র্ভাব হয়। এই বীরপুরুষের আবির্ভাবে শিখেরা মহাবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। ইহাঁর ক্ষমতায়—ইহাঁর প্রাধান্যে একটি বহুবিস্তৃত-পরাক্রান্ত স্বাধীনরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। অসাধারণ বীরত্বমহিমায় ইনি বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হন। এই মহাবীরের নাম রণজিৎ সিংহ।

---

* হায়দর আলি।

সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাপন্ন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। রণজিৎ সিংহ ১৭৮০অব্দের ২রা নবেম্বর গুজরণবালায় জন্মগ্রহণ করেন। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণপণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্ব্বাংশে পিতার এই সাহস ও রণপাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়, এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে "কাণা রণজিৎ" নামে প্রসিদ্ধ হন। রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময়ে মহাসিংহের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। রণজিৎ এই সময় তাঁহার মাতা এবং পিতার দেওয়ান লক্ষীপৎ সিংহের রক্ষাধীন হন। তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি এই বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হন। এই সময়ে পঞ্জাবে দোর্‌রাণী ভূপতির আধিপত্য ছিল। ইঙ্গ্‌রেজেরা ক্রমে প্রবল হইয়া আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত করিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার বল সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমে ইঙ্গ্‌রেজদিগের ক্ষমতা-স্পর্দ্ধী হইয়া উঠিতেছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইহাঁদের মধ্যে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করেন। অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর পৌত্র জেমান শাহ একদা প্রবল বর্ষার সময় আপনার কামান বিতস্তা নদীর অপর পারে লইয়া যাইতে অসমর্থ হন। রণজিৎ সিংহের ক্ষমতায় এই সকল কামান নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হয়। জেমান শাহ এজন্য সন্তুষ্ট হইয়া রণজিৎ সিংহকে লাহোরের আধিপত্য দেন। এই সময় রণজিতের বয়স উনিশ বৎসর। রণজিৎ এই তরুণ বয়সে স্বীয় ক্ষমতাবলে লাহোরের অধিপতি হইলেন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত মণ্ডল তাঁহার আয়ত্ত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে মুলতান, পেশাবর প্রভৃতি স্থানে আফগানদিগের আধিপত্য ছিল। রণজিৎ সিংহ এই সকল স্থানে আপনার ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস বিফল হয় নাই। তিনি প্রথমে আফগামদিগকে দূরীভূত করিয়া, মুলতান অধিকার করেন; পরে ভারতের নন্দন-কানন কাশ্মীরে জয়পতাকা উড়াইয়া দেন। কাশ্মীর অধিকার-কালে মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গাসিংহ সৈন্যদলের অগ্র-ভাগে ছিলেন। রণজিতের সাহসী অশ্বারোহিগণ পদাতিক সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া পদব্রজে দুরারোহ পর্ব্বত অতি-ক্রমপূর্ব্বক কাশ্মীরে উপস্থিত হয়। শিখদিগের বিক্রমে আফ-গান সেনাপতি জব্বর খাঁ পরাজয় স্বীকার করেন। বহুদিনের পর হিন্দু ভূপতির বিজয়-পতাকায় কাশ্মীর আবার শোভিত হইয়া উঠে।

ইহার পর রণজিৎ সিংহ পেশাবর অধিকার করিতে উদ্যত হন। শিখদিগের ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান ঘটনা। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ ভারতের একটি প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র দিন। যাহারা দৃষদ্বতী নদীর তীরে হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া ভারত-বর্ষে আধিপত্য স্থাপন করে, শিখেরা এই দিনে তাহাদের দেশে আপনাদের জয়-পতাকা স্থাপন করিতে অগ্রসর হয়। এক দিকে দীর্ঘকায়, ভীমমূর্ত্তি আফগান জাতি, অপর দিকে সাহসী, যুদ্ধ-কুশল শিখ সৈন্য। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নৃপতি এই শেষ বার সিন্ধু নদের অপর পারে হিন্দু-বিজয়ী পাঠানের শোণিত-জলে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের আত্মার পরিতর্পণ করিতে উপস্থিত। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মহোল্লাসে পঞ্চনদে প্রত্যাবৃত্ত হন। নওশেরার সংগ্রামে শিখেরা যেরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করে, তাহাতে সমগ্র আফগানিস্তান বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠে।

এই যুদ্ধে রণজিৎ সিংহের সেনাপতি—অকালী সম্প্রদায়ের অধি-নায়ক ফুলাসিংহ যেরূপ লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া বিজয় লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং যেরূপ লোকাতীত সাহসের সহিত যবন-সৈন্য নির্ম্মূল করিতে করিতে শেষে সেই নওশেরার সমরস্থলে—সেই পবিত্রতাময় পরম তীর্থে অকাতরে, অম্লানভাবে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হন, তাহা চিরকাল ইতিহাসের পত্রে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকার যোগ্য। এই মহাযুদ্ধে প্রথমে শিখদিগের পরাক্রম বিচলিত হইয়াছিল, প্রথমে পাঠানেরা জয়ী হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। রণজিৎ সিংহের ইউরোপীয় সেনাপতি বেণ্টুরা ও এলার্ডও প্রথমে আফগানদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে রণজিৎ সিংহ বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার সৈন্যদিগকে একত্র করিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া সৈন্য-দিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃথা অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, ভৈরব রবে সৈন্যদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বিক্রমে, অপূর্ব্ব স্থিরতায় ও অপূর্ব্ব সাহসে কোনও ফল হয় নাই। রণজিৎ সিংহ অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন, সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রায় বিমুখ দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে একাকীই তরবারি আস্ফা-লন করিতে করিতে বিপক্ষের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে "ওয়া গুরুজি কি ফতে" এই আশ্বাসবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল; এ বাক্য দূরাগত বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর রবে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, একবারে আশা, ভরসা ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিল। রণজিৎ সিংহ সবিস্ময়ে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন,

ফুলাসিংহ নীল বর্ণের পতাকা উড়াইয়া পাঁচ শত মাত্র অকাল-সৈন্যের সহিত "ওয়া গুরুজি কি ফতে" শব্দ করিতে করিতে সেই গণনাতীত পাঠান-সৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ফুলাসিংহকে বিপক্ষের গুলির আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই আঘাতে ফুলাসিংহের হাঁটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া যে, স্থানান্তরিত করিয়াছিল, রণজিৎ সিংহ তাহাও দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ বার তিনি দেখিলেন, ফুলাসিংহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত আপনার সৈন্য চালনা করিতেছেন। গুলির আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রশস্ত ললাটে ভীতি-ব্যঞ্জক রেখার আবির্ভাব নাই, বিস্তৃত লোচন-দ্বয়ে দুশ্চিন্তা বা নিরাশা-সূচক কালিমার আবেশ নাই। ফুলাসিংহ হস্তীর উপর হইতে নির্ভয়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিতেছেন, "ওয়া গুরুজি কি ফতে!" তাঁহার সৈন্যগণ গুরু গোবিন্দসিংহের মন্ত্রপূত—এই প্রাতঃস্মরণীয় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া পাঠান সৈন্য নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইতেছে। ফুলাসিংহের এই তেজস্বিতা দেখিয়া পঞ্চনদের অধীশ্বর প্রীত, চমৎকৃত ও আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কে বলে গুরু গোবিন্দসিংহের মৃত্যু হইয়াছে? কে বলে গুরু গোবিন্দ-সিংহের মহাপ্রাণতা তাঁহার দেহের সহিত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নওশেরার এই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রেও গোবিন্দসিংহ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তদীয় জীবন্ত উৎসাহপূর্ণ বাক্য এ সমরভূমিতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে মাতাইয়া তুলিয়াছে। ফুলাসিংহ আজ গুরু গোবিন্দের মহাপ্রাণতায় মহিমান্বিত হইয়া তাঁহার মন্ত্রপূত শোণিত অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ বিনশ্বর

জগতে শিখ-গুরুর এ মহিমার বিলয় হইবে না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ফুলাসিংহকে পাঠানের ব্যূহভেদে অগ্রসর দেখিয়া অসামান্য বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এ বার ফুলাসিংহের পরাক্রম পাঠানেরা সহিতে পারিল না। অকালীরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যবন সৈন্য নির্ম্মূল করিতে লাগিল। ক্রমে রণজিৎ সিংহের অপরাপর সৈন্য আসিয়া অকালীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ যে হস্তীতে ছিলেন, তাহার মাহুতের শরীরে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও একটি গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দৃঢ়তার সহিত শত্রুর মধ্যে হাতী চালাইতে মাহুতকে আদেশ দিলেন। আহত মাহুত এ বার আদেশ পালনে অসম্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃ পুনঃ আদেশেও মাহুত যখন অগ্রসর হইল না, তখন ফুলাসিংহ সক্রোধে মাহুতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন। মাহুত পড়িয়া গেল। ফুলাসিংহ হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তী চালনা করিয়া, শত্রুর মধ্যে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষের একটি গুলি আসিয়া তাঁহার ললাটে প্রবিষ্ট হইল। বীর-কেশরী এ আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁর প্রাণশূন্য দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়া গেল। অধিনায়কের মৃত্যুতে অকালীগণ ছত্রভঙ্গ হইল না। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সাহসসহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। আফগান সৈন্য এ আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। নওশেরার সমরক্ষেত্রে ফুলা-সিংহের লোকাতীত পরাক্রমে বিজয়-লক্ষ্মী পঞ্জাব-কেশরীর অঙ্ক-শায়িনী হইলেন।

পাঠানেরা যার-পর-নাই বিস্ময়ের সহিত ফুলাসিংহের এই লোকাতীত বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিল। যে স্থলে ফুলাসিংহের

মৃত্যু হয়, সে স্থলে একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থান হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই একটি পরম পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই এই পবিত্র তীর্থে সমাগত হইতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ই ভক্তি-রসার্দ্র-হৃদয়ে ফুলাসিংহের উদ্দেশে স্তুতিবাদ করিতেন। যত দিন এক-চক্ষু বৃদ্ধ শিখ-ভূপতি জীবিত ছিলেন, তত দিন যখন নওশেরার যুদ্ধের প্রসঙ্গে ফুলাসিংহের কথা উঠিত, তখনই তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতর হইত, এবং তাহা হইতে অবিরল-ধারায় মুক্তাফল বাহির হইয়া গণ্ডদেশে পড়িত। বীর-ভক্ত বীর-কেশরী এইরূপ পবিত্র শোকাশ্রুতে ফুলাসিংহের পরলোকগত পবিত্র আত্মা সন্তৃপ্ত করিতেন।

রণজিৎ সিংহ জাতি-প্রতিষ্ঠার বলে এইরূপ দুর্জ্জেয় হইয়া পঞ্জাব শাসন করেন। তাঁহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাবর, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, আর তাঁহার যুদ্ধ-কুশল সৈন্যগণ ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পাইয়া বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া উঠে। রণজিৎ সিংহ ইঙ্গ্রেজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি মহাবল-পরাক্রান্ত হইলেও ইঙ্গ্রেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া পবিত্র মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই।

রণজিতের জীবনী-লেখক বলিয়াছেন, 'রণজিৎ সিংহ যথার্থ সিংহের মত ছিলেন, এবং সিংহের মতই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।' এই সিংহবিক্রম মহাবীরের সমস্ত কথা এ স্থলে আনুপুর্ব্বিক বিবৃত করা সম্ভাবিত নহে। যাঁহারা যথানিয়মে সুশিক্ষা পাইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই মহাপুরুষের তুলনা করাও উচিত নহে। রণজিৎ সিংহের সাহস, ক্ষমতা ও বুদ্ধি

ন্যের প্রদত্ত শিক্ষায় পরিস্ফুট হয় নাই। এগুলি আপনা হইতেই বকাশ পাইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ আপনার এই স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জগতের মধ্যে মহৎ লোকের সম্মানিত াদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। আপনার সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত ও রণ-পারদর্শী করা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। তিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। ফরিদখাঁ সুর একাকী ব্যাঘ্র বধ করিয়া "শের" নাম ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অস্তাজিলো এক সময়ে এই-রূপ সাহস দেখাইয়া, "শের আফগান" নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতুল লাবণ্যবতী নূরজাহানের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এই দুই বীরের, এই সাহসের কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলের বিস্ময় জন্মাইতেছে। কিন্তু রণজিতের সাহসী শিখ সৈন্য মৃগয়ার সময় একাকী পশুরাজ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতেও কাতর হয় নাই। তাহারা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে; তাহারা অশ্বারোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে এবং শত্রুপক্ষের ব্যূহ-ভেদে পৃথিবীর যে কোন যুদ্ধ-বীরের তুল্য যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে।

বস্তুতঃ রণজিৎ সিংহ বীর-লীলাস্থল ভারতের যথার্থ বীর পুরুষ। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় বীর পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ যখন তিরৌরীর পবিত্র ক্ষেত্রে পাঠানদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়াছিলেন, এবং শেষে যখন পুণ্যসলিলা দৃষদ্বতীর তটে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বীরত্বে শত্রুর হৃদয়েও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, অদীন-পরাক্রম প্রতাপসিংহ যখন ভারতের ধর্ম্মাপলী পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখি-

য়াও ধীরগম্ভীরস্বরে কহিয়াছিলেন, এই ভাবে দেহবিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহার লোকাতীত মহাপ্রাণতা ও স্বদেশের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আত্মত্যাগ দেখিয়া বিধর্ম্মী শত্রুও শতমুখে তদীয় প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছিল, আবার মহাবিক্রম শিবজী যখন পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে যাইয়া, বিজয়-ভেরীর গভীর নিনাদে নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, তখন ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ও তাঁহার অপূর্ব্ব দেশভক্তি ও অপূর্ব্ব বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ বীরপুরুষগণের অনন্ত মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল, উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এক হইয়া এক সময়ে এই বীরপুরুষগণের অনন্ত ও অক্ষয় কীর্ত্তির কাহিনী ঘুষিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু এই বীরত্ব-বৈভব শিবজীর সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীর্য্য-বহ্নির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গে ভারতের যবনরাজগণের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা এই মহাশক্তির ভক্ত শক্তিশালী ভূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া যায় নাই। শিবজীর পর গুরু গোবিন্দসিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবীত হইয়া, রণজিৎ সিংহ আবার ভারতে এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন, আবার চারি দিকে বীরত্বমহিমা প্রসারিত করিয়া ভৈরব রবে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

নানাস্থানে নানাযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সাতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সহিষ্ণুতা প্রযুক্ত তিনি প্রখর আতপ, দুরন্ত শীত, প্রবল বায়ু বা ঘোরতর বর্ষা, কিছুতেই দৃক্‌পাত করিতেন না। পঞ্জাবে প্রাধান্য স্থাপনে, আফগানিস্তানে আত্মগৌরব সংরক্ষণে, তাঁহাকে প্রতিকূল প্রকৃতির সহিতও সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এইরূপ নানা অমিতাচারে ১৮৩৪ অব্দে তাঁহার রোগের সঞ্চার হয়। তিনি এই রোগে কিছু

কাল অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। শেষে রোগের শান্তি হইল বটে, কিন্তু উহার প্রভাবে তাঁহার পক্ষাঘাত জন্মিল। তিনি অচল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রোধ হইল। তিনি কেবল অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা আপনার অভাব ও আপনার অভিপ্রায় জানাইতেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁহার তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয় নাই, সাহস ও উদ্যম পর্য্যুদস্ত হইয়া যায় নাই। এ অবস্থাতেও তিনি আপনার অসাধারণ মানসিক ক্ষমতা, অবিচলিত তেজস্বিতা এবং অপরিমেয় সাহস ও উদ্যম দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে রণজিৎ হস্ত পদ চালনা করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু বাক্‌শক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। দুরন্ত রোগের কঠোর পীড়নে তাঁহার দেহ এইরূপ শিথিল হইয়াছিল, তথাপি তিনি অশ্বারোহণে মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেন। ফিরোজপুরে একদা তিনি অপরের সাহায্যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তিনি চির-ব্যবহৃত তরবারি বা চিরাভ্যস্ত বন্দুক ধরিতে পারিলেন না। রোগের এইরূপ কঠোর আক্রমণে, জীবনী-শক্তির এইরূপ অন্তর্ধানেও তিনি একাগ্রতা ও অটলতা হইতে স্খলিত হইলেন না। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতর হইল। তিনি অস্ত্র পরিগ্রহ না করিয়াও, অশ্বারোহণে আপনার লোকাতীত মানসিক শক্তির বিকাশ দেখাইতে লাগিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। এইরূপ তেজস্বিতা ও এইরূপ দৃঢ়তা তাঁহাকে মহাবীরের সম্মানিত পদে স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু মহাবীর দুরন্ত রোগের কঠোর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইলেন না। রোগ ক্রমে প্রবল হইল। ভারতের অসাধারণ বীরপুরুষ ১৮৩৯ অব্দের ৩০এ জুন ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ দেখিতে খর্ব্বকায় ছিলেন। তাঁহার

চক্ষুটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল ছিল। যখন তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, তখন এই চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। সে অপূর্ব্ব জ্বালাময়ী দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইত, সেই কম্পিত হইয়া উঠিত। এই উজ্জ্বল চক্ষুই তাঁহার একাগ্রতা ও তাঁহার তেজস্বিতার অদ্বিতীয় পরিচয়-স্থল ছিল। তিনি যখন আমোদ করিতেন, তখন দর্শকগণ তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইত। তাঁহার সহাস্যমুখ প্রীতিকর ও তাঁহার বাক্‌চাতুরী হৃদয়গ্রাহিণী ছিল। তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার কখনও কোন কথার অভাব লক্ষিত হইত না। অশ্বারোহণে, সামরিক কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সমরে তিনি সকলের অগ্রে থাকিতেন, এবং পশ্চাদ্‌গমন-সময়ে সকলের পশ্চাতে থাকিয়া অভয় দিতেন। তাঁহার সমগ্র জীবন কেবল যুদ্ধ-কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি এই যুদ্ধময় জীবনে কখনও কোনরূপ ভয়ের পরিচয় দেন নাই। উৎসব ব্যতীত তিনি সমৃদ্ধ বেশে সজ্জিত হইতেন না। উৎসব-সময়ে তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদে জগদ্‌বিখ্যাত কোহিনূর* শোভা বিকাশ করিত। তিনি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতেন, এবং অশ্বারোহণে দুই এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। বেলা আটটার সময় তাঁহার আহার হইত।

---

*কোহিনূরের ইতিবৃত্ত বড় অদ্ভুত। কিংবদন্তী অনুসারে এই মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইযা মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপরে উহা উজ্জয়িনীরাজের শিরোভূষণ হয়। খৃীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালব দেশ অধিকার করিযা উহা লাভ করেন। পাঠান-রাজত্বের ধ্বংশ হইলে উক্ত মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর নাদির শাহ দিল্লী-আক্রমণ সময়ে উহা গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহম্মদ শাহ উহা প্রাপ্ত হন। ক্রমে উহা শাহ সুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ শাহ সুজাকে পরাজিত করিয়া উহা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি কোহিনূরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে রণজিৎ সিংহ হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "এস্‌কো কিমৎ পাঁচ জুতি" অর্থাৎ [illegible] উহা পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে।

দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রাতঃকালীন ভোজনের সময়ের দিকে রণজিৎ সিংহের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি কখনও এই সময় অতিক্রম করিয়া আহার করিতেন না। একদা মহারাজ রণজিৎ সিংহ গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পার্শ্বে বসিয়া সৈন্য পরিদর্শন করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে ভোজন-সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি আসন হইতে উঠিয়া গেলেন এবং যথাসময়ে ভোজন সমাপ্ত করিয়া, আবার গবর্ণর জেনেরলের পার্শ্বে বসিয়া সৈন্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে রণজিৎ সিংহ শাস্ত্রালোচনার অবসর পাইতেন না। কিন্তু তিনি বিদ্যার সমাদর করিতেন। শিখগুরুগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাঁহাকে পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। রণজিৎ সিংহ মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। মৃগয়ার আমোদে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তিনি সুকুমার-মতি বালকদিগের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সর্দ্দারদিগের অনেক সন্তান তাঁহার সমক্ষে শিক্ষিত হইত। অশ্বারোহণে, অস্ত্র-সঞ্চালনে তিনি ইহাদিগকে সুনিপুণ করিয়া তুলিতেন। কেহ কোনরূপ অলৌকিক ঘটনা বা দক্ষতা দেখাইলে রণজিৎ সিংহ তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক দিতে উদাসীন থাকিতেন না। হরিদাস সাধু নামক এক জন যোগী চল্লিশ দিন একটি বাক্‌সে নিরুদ্ধ হইয়া মৃত্তিকার নীচে থাকেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই অসাধারণ যোগীকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

রণজিৎ সিংহ স্বরাজ্যের সকলের অভাব মোচনেই যত্নশীল ছিলেন। সকলের প্রার্থনা যাহাতে তাঁহার গোচর হয়, এই জন্য তিনি একটি গৃহে বাক্‌স রাখিয়াছিলেন। সকলেরই এই গৃহে যাইবার অধিকার ছিল। মহারাজের নিকট যাহাদের কোন প্রার্থনা

থাকিত, তাহারা আবেদন-পত্র লিখিয়া এই বাক্‌সে ফেলিয়া দিত। বাক্‌সের চাবি রণজিৎ সিংহ আপনার নিকট রাখিতেন। তিনি এই সকল আবেদন পড়িয়া আবেদনকারীদিগের অভাব-মোচন করিতেন।

নারী-চরিত।

মীরাবাই।

মীরাবাই ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বর-প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যেমন কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন, সকলপ্রকার ভোগসুখে তাচ্ছীল্য দেখাইয়া মূর্ত্তিমতী সারস্বতী শক্তির ন্যায় যেমন তদ্‌গত-চিত্তে স্বীয় বরণীয় দেবতার গুণ গান করিয়াছেন, অবলাপ্রকৃতিতে তেমন তপস্বি-ধর্ম্ম প্রায় দেখাযায় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে সেই ঈশ্বর-নিষ্ঠা ও ভক্তিপরায়ণতা জানা যাইবে।

মীরাবাই মেরতা নামে রাজপুতনার একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের এক-জন রাঠোর বংশীয় রাজার কন্যা। মিবারের রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মীরা অনুপযুক্ত ব্যক্তির সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। সাহস, পরাক্রম ও শাসন-দক্ষতায় কুম্ভ মিবা-রের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। যে গৌরব-সূর্য্য দৃষদ্বতী নদীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে নিমগ্ন-প্রায় হইয়াছিল, দুরন্ত পাঠান-রাহুর পরাক্রমে যাহার প্রচণ্ড কিরণ অন্ধকারে পরিণতি পাইয়াছিল, রাণা কুম্ভের ক্ষমতা-বলে তাহা ধীরে ধীরে সমস্ত মিবার আলোকিত করিয়া তুলে। কুম্ভ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনু-ষ্ঠান করেন। তিনি অসামান্য পরাক্রমে ও অসামান্য সদাশয়তায়

তৎসমকালীন অনেক রাজাকে অধঃকৃত করিয়াছিলেন। খিলিজি-বংশের রাজাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিলে কয়েকটী মুসলমান রাজ্য দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল উচ্ছেদ করিয়া স্ব-প্রধান হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে মালব ও গুজরাটের অধিপতি সমবেত হইয়া রাণাকুম্ভের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে মালবের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। কুম্ভ এক-লক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং প্রভূত পরাক্রমে বিপক্ষদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজধানী চিতোরে প্রত্যাগমন করেন। এই যুদ্ধে মালবের অধিপতি কুম্ভের বন্দী হন। কুম্ভ পরাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য দেখান নাই। তিনি বীর-ধর্ম্ম ও বীর-পদ্ধতি অনুসারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় অতুল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীরধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই, এবং সেই বীর-পদ্ধতিরও গৌরব-হারী হন নাই। কুম্ভ মালবের অধিপতিকে অনেক অর্থ দিয়া বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত করেন। এই কার্য্যে কুম্ভের একদিকে যেমন বীরত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অন্যদিকে তেমন সৌজন্য ও সদাশয়তা পরিস্ফুট হইতেছে।

কুম্ভ মিবারে অনেকগুলি গিরি-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মিবার রক্ষার্থ যে চৌরাশীটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহার মধ্যে চৌত্রিশটী রাণা কুম্ভের সংগঠিত। কুম্ভমীর (প্রচলিত নাম কমলমীর) রাণা-কুম্ভের অসাধারণ কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এই দুর্গ শত্রুগণের অভেদ্য বলিয়া চিরকাল রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। রাণা কুম্ভের গুণ-গৌরব কেবল এই সমস্ত কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই, সুকবি ও সুবিদ্বান বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে প্রসারিত

হয়। কুম্ভ বঙ্গের কবি-কুল শিরোমণি জয়দেবের প্রণীত গীত-গোবিন্দের এক খানি টীকা প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই টীকা এক্ষণে সচরাচর পাওয়া যায় না। মীরাবাই কিরূপ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমর্পিত হইয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য এই সুযোদ্ধা, সুরাজা ও সুবিদ্বানের সম্বন্ধে এত কথা লিখিত হইল। মীরাবাই পতির এই সৌভাগ্য-সুখের কিরূপ অংশ পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে!

ভক্তি হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি। যদি ক্ষণকালের জন্যও ভক্তির কার্য্য স্থগিত হয়, তাহা হইলে হৃদয় বিশুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় সাতিশয় শোভাহীন হইয়াপড়ে। ভক্তি নিয়ত ঊর্দ্ধ-গামিনী। গতি ও উত্থান বিষয়ে ইহা কল্পনাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভক্তিরসে পরিপ্লুত থাকে, তিনি মানব হইয়াও দেব লোকের পবিত্র সুখ সম্ভোগ করেন, এবং মর্ত্ত্য হইয়াও অমরভোগ্য পবিত্র সুধার রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোমদ, যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ, তৎসমুদয়ই এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া নিয়ত তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। ভক্তি কখনও কোন প্রকার পার্থিব পঙ্কে কলুষিত হয় না। ইহা পবিত্র-সলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় নিয়তই স্বচ্ছ, আবিলতা-বর্জ্জিত ও জীবনতোষিণী। যথার্থ ভক্তি-মান্ ব্যক্তি কখনও নীচতা বা হীনতার কর্দ্দমে নিমগ্ন থাকেন না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা নির্ম্মল ও কমনীয় থাকে। তিনি ভ্রমর-চুম্বিত প্রভাত-কমলের মনোহর মাধুরী দেখিয়া যেমন পরি-তৃপ্ত ও সুখী হন, অনন্ত জড় জগতের অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখি-য়াও তেমনই সুখী ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তরঙ্গায়িত সাগ-রের ভীষণ মূর্ত্তি, চঞ্চল তড়িল্লতার অপূর্ব্ব বিকাশ, উন্নত ভূধর-

মালার গম্ভীর দৃশ্য, দিগ্‌দাহকারী দাবানল ও প্রলয় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতিতে তাঁহার হৃদয় সেই অনন্ত শক্তির অনন্ত স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। তিনি সংসারী হইয়া ও যোগী, মানব হইয়াও দেবলোক বাসী এবং সংসার সমুদ্রের নগণ্য জল-বুদ্‌বুদ্‌ হইয়াও মহীয়সী শক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন। এ নশ্বর জগতে—এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে কাহারও সহিত তাহার তুলনা সম্ভবে না।

যথার্থ ভক্তি এইরূপ পবিত্র ও অনবদ্য, যথার্থ ভক্তিমানের হৃদয় এইরূপ উচ্চতম গ্রামে সমারূঢ়। ভক্তি অনেক বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে দেবতার দিকে যে ভক্তি জন্মে, মীরাবাই তাহারই জন্য সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইতেছেন। দেব-ভক্তি অপূর্ণকে পরিপূর্ণ ও অসুন্দরকে সৌন্দর্য্যের রেখাপাতে শোভিত করে। মনুষ্য এই জড় জগতে ক্ষুদ্রতম জীব। প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহার অস্থায়ী শরীরের স্থিরাংশের ধ্বংশ হইতেছে। ঊর্ম্মিমালা যেমন গৌরবে কিয়ৎক্ষণ বক্ষঃ স্ফীত করিয়া জল-গর্ভে বিলয় পায়, বিদ্যুল্লতা যেমন মুহূর্ত্ত মাত্র প্রভা বিকাশ করিয়া নবজলধর-সমূহে অন্তর্হিত হয়, নশ্বর মানবও তেমনই এই নশ্বর জগতে কিয়ৎক্ষণ লীলা করিয়া কালের অনন্ত স্রোতে বিলীন হইতেছে। অপূর্ণ ও অস্থায়ী জীব ইহা বিবেচনা করিয়া ভক্তির সাহায্যে সহজেই সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরাৎপরে সংযতচিত্ত হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান সংসারের অস্থায়িত্ব ও নিজের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ব ভাবিয়া মনুষ্য আপনা হইতেই অনন্তশক্তিমান্ দেবতার শরণ লয়, এবং এই দেব-ভক্তির বলে সৌন্দর্য্যের উচ্চতম মন্দিরে আরোহণ করিয়া পবিত্র আনন্দের রসাস্বাদ করিতে থাকে। কেহ শিখায় না, কেহ বলিয়া দেয় না।

তথাপি এই ভক্তি ঊর্দ্ধে উঠিয়া মনুষ্যকে বরণীয় দেবতার স্বরূপ চিন্তায় নিয়োজিত করে। এই জন্য সাধনা বলবতী হয় এবং এই জন্যই তপস্যা মহীয়সী হইয়া থাকে। তরঙ্গিণী যেমন সাগরের দিকে অবিরামগতি প্রবাহিত হয়, ভক্তির প্রবল বেগে সাধনা ও তপস্যাও সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। কেহই এই অসীম ভক্তির গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি শক্তিতে অসীম, দয়ায় অসীম, পরিমাণে অসীম; অসীম ভক্তিস্রোত যখন তাঁহাকে পাইবার জন্য তাড়িত বেগকেও উপহাস করিয়া ধাবমান হয়, তখন সঙ্কীর্ণ-শক্তি, সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সামান্য মানব কিছুতেই সে স্রোত আপনার ক্ষমতার আয়ত্ত করিতে পারে না। এরূপ স্থলে মানবী শক্তি আপনাহইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, এবং কুকর্ম্মের ন্যায় আপনাতেই আপনি লুক্কাইত হইয়া থাকে।

মীরাবাই এই দেব-ভক্তির বলে অটল হইয়া সমুদয় পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার গুণ সম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির অধিপতি পতি দিয়াছিলেন, তথাপি মীরার ভাগ্যে ভোগ-সুখ ঘটিয়া উঠে নাই। মীরা সাতিশয় বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। তিনি স্বামি-গৃহে যাইয়া পরম-বৈষ্ণবী হইয়া উঠিলেন, এবং আত্মসংযত ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া রণছোড় নামক আরাধ্য কৃষ্ণ মূর্ত্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার স্বামীর অন্যান্য পরিবারবর্গ প্রগাঢ় শক্তি-উপাসক ছিলেন। এজন্য স্বামি-গৃহে গমনের অব্যবহিত পরেই মীরার সহিত তাঁহার শ্বশ্রূর ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকট বিবাদ আরম্ভ হইল। মীরার শ্বশ্রূ মীরাকে বিষ্ণু উপাসনায় বিরত ও শক্তি উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী

হইল না। মীরা যে ভক্তির স্রোতে দেহ ভাসাইয়াছিলেন, রাজ-মাতা সে স্রোত নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। এজন্য রাজ মাতা মীরাকে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন। মীরা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন বটে, কিন্তু ভক্তি হইতে স্খলিত হইলেন না। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন, প্রগাঢ় ভক্তি-যোগ সহকারে তাহা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, রাণা কুম্ভ মীরার আবাসের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান ও ভরণপোষণের জন্য কিছু অর্থ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, মীরা স্বামি-গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া রণছোড়ের আরাধনায় রত হইলেন। অনেক নিরাশ্রয় বৈরাগী তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। মীরা এইরূপে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-ভূমি হইয়া দয়া-ধর্ম্ম-পরায়ণা তপস্বিনীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে মীরাবাই মথুরা ও দ্বারকা তীর্থে গমন করেন। কথিত আছে, মীরা যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন রাণা আপনার অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং মীরাকে আনিবার জন্য কয়েক জন ব্রাহ্মণ দ্বারকায় পাঠাইয়া দেন! মীরা দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার আরাধ্য-দেবের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপা-সনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং মীরা তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র উহা পূর্ব্ববৎ অবিভক্ত হইয়া গেল। এই অবধি মীরাবাই চিরকালের মত নর-লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অদ্যাপি মিবারে রণছোড় নামক কৃষ্ণ-মূর্ত্তির সহিত মীরা বাইর পূজা হইয়া থাকে। সাধা-রণে নির্দ্দেশ করে যে, এই পূজা মীরা বাইর অন্তর্দ্ধানের স্মরণ-সূচক ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রবাদ আছে, মীরাবাই এসম্বন্ধে

দুটী পদ রচনা করিয়া আপনার প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন, এস্থলে সেই পদ দুটীর অনুবাদ প্রকাশ করা যইতেছে,—

১মপদ। "রাজন্ রণছোড় ! দ্বারকায় আমাকে স্থান দাও এবং তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দ্বারা যমভয় নিবারণ কর, তোমার পবিত্র মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং তোমার শঙ্খ ও করতাল ধ্বনিতে পরম আনন্দ রহিয়াছে। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি, প্রেম সমুদয়ই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিণী হইয়া আসিয়াছে, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।"

২য়পদ। "তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর। তোমা বিনা আমাকে দয়া করে এমন আর কেহ নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। হে মীরাপতি ! হে প্রিয় গিরিধর ! মীরাকে গ্রহণ কর। তোমার সহিত যেন আর কখনও আমার বিয়োগ না হয়।"

মীরা বাইর কোন ধারাবাহিক জীবন-চরিত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত ঘটনাই এক্ষণে উপকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মীরা পরমসুন্দরী ছিলেন। সৌন্দর্য্য-গরিমায় তৎকালে প্রায় কেহই তাঁহার তুলনীয়া ছিল না। কিন্তু তাঁহার বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য অধিক ছিল। তাঁহাব যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ঈশ্বর-ভক্তি, ঈশ্বর-প্রেম ও স্বার্থত্যাগের অসাধারণ চিহ্ন দেখা যায়। মীরা দেব-ভক্তির নিমিত্ত অতুল রাজত্ব-সুখ ও অতুল ভোগ-বিলাসে উপেক্ষা দেখাইয়া ছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হয়,নাই। প্রগাঢ় সাধনা ও প্রগাঢ় তপস্যায়

তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল থাকিত। মীরাবাইর অন্তর্দ্ধান-ঘটনা যদিও নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা-মূলক ও অবিশ্বাসযোগ্য, তথাপি উহা তাঁহার উৎকট সাধনার পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ মীরাবাই যে আপনার সাধনায় অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সাধনা ও তপস্যার জন্যই তিনি অনেকের নিকট দেবীভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

মীরাবাই সুকবি ছিলেন। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত রয়, কবিতার মোহিনী মাধুরী সহজেই তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পবিত্র ভক্তির মহিমায় মীরার কবিতাও হিমাচল-নিঃসৃতা পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীর ন্যায় অবিরল ধারায় নির্গত হইত। মীরাবাইর রচিত পদাবলি অনেকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি মধ্যে তাঁহার রচিত অনেক সংগীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রচনা-নৈপুণ্য ব্যতীত মীরাবাইর সঙ্গীত শাস্ত্রেও অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। প্রবাদ আছে প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ মীরা-বাইর অসামান্য সঙ্গীত-শক্তির বিবরণ শুনিয়া সংগীতবিৎ তান-সেনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, এবং তদীয় কোমল কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুমধুর গীতাবলি শুনিয়া পরিতুষ্ট হন। বোধ হয়, কোন গ্রন্থকার মীরা বাইকে আকবর শাহের সমকালবর্ত্তিনী বলিয়া উল্লেখ করাতেই এই প্রবাদের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু এই নির্দ্দেশ সমীচীন বোধ হয় না।

মীরাবাইর নামে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মীরাবাই এবং তাঁহার ইষ্টদেব রণ-ছোড়কে বিশিষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

সংযুক্তা*।

সংযুক্তা কান্যকুব্জ-পতি জয়চন্দ্রের দুহিতা। ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কবি চাঁদবর্দ্দৈ চৌহানরাসোর কানোজখণ্ডে ইহাঁর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। সংযুক্তা তাৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার কেবল অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল না, অসাধারণ উদারতাও ছিল। সংযুক্তার গুণগরিমা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, কবিচাঁদ তাঁহাকে কান্যকুব্জের লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণনা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

জয়চন্দ্র রাঠোর-বংশীয় রাজপুতদিগের এবং দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ চৌহান-বংশীয় রাজপুতদিগের প্রধান ছিলেন। এই রাঠোর ও চৌহানকুলের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল। কেবল রাজ্য-কামুকতা হইতেই এই বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। এই সময়ে দিল্লী, আজমীর, কান্যকুব্জ ও গুজরাট এই চারিটী প্রধান হিন্দু রাজ্য ছিল। এই চারি রাজারাই এক গোষ্ঠী ছিলেন। দিল্লীর অধিপতির সন্তান না হওয়াতে তিনি আপনার দৌহিত্র আজমীর-রাজ পৃথ্বীরাজকে পোষ্য পুত্র করিয়াছিলেন। ইহাতে পৃথ্বীরাজ দিল্লীর শাসনদণ্ড অধিকার করেন। এদিকে কান্যকুব্জের রাজাও দিল্লীর অধিপতির দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া পৃথ্বীরাজের শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন। এজন্য উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাদি হইত। এই আত্মবিগ্রহে শেষে

---

* কেহ কেহ ইহাঁকে "সঞ্জোগতা" নামে নির্দ্দেশ করেন। অধিকন্তু "রাজাবলিতে" ইহাঁর নাম "অনঙ্গমঞ্জরী" লিখিত আছে।

কান্যকুব্জ ও দিল্লী উভয়েরই পতন হয়। যাহা হউক, পৃথ্বী-রাজ অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, একদা প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়া, তদীয় পরম শত্রু জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। জয়-চন্দ্র স্বীয় গৌরব ও প্রাধান্য অপ্রতিহত করিবার জন্য, অবিলম্বে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। এই শেষ বার ক্ষত্রিয়ের রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের অভীষ্ট মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। ভারতীয় রাজন্যশ্রেষ্ঠের মধ্যে সকলেই এই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, কান্যকুব্জে আগমন করেন। কেবল দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও মিবারের অধিপতি সমরসিংহের আগমন হয় না। ইহাঁরা আপনা-দের বর্ত্তমানে জয়চন্দ্রকে উক্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। জয়চন্দ্র এজন্য অভিমানী হইয়া পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের দুটী হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাক্রমে দ্বারবান্ ও স্থালী পরিষ্কারকের পদে প্রতি-ষ্ঠিত করেন। এদিকে আড়ম্বরের সহিত রাজসূয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। যজ্ঞান্তে কান্যকুব্জ-লক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ হইতে থাকে। স্বয়ম্বরপ্রথা রমণীকুলের মনোমত বর-নির্ব্বাচনের উৎকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বে এই স্বয়ম্বর সকলের সর্ব্বপ্রকার গুণ-গ্রা-মের অদ্বিতীয় পরিচয়-স্থল ছিল। বর্ণনীয় সময়ে এই চিরন্তন রীতি আর্য্যসমাজ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই পদ্ধ-তির অনুবর্ত্তী হইয়া গুণ-গৌরব-শ্রেষ্ঠ বাহুবল-দৃপ্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে কান্যকুব্জের স্বয়ম্বর-সভা অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। রাজগণের অধিবেশনের পর সংযুক্তা স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, হস্তে বরমালা ধারণ পূর্ব্বক ধাত্রীর সহিত সভা-গৃহে সমাগত হইলেন।

যে গুণানুরাগ হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া, মানবী প্রকৃতিকে দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে, তাহা কখনও সামান্য বাহ্য আবরণে নিবারিত হয় না। সংযুক্তা ইহার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের অলোকসামান্য গুণ, অলোকসামান্য সাহস ও অলোকসামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পিতার শত্রুতায় সে আসক্তি নিরাকৃত হইল না। তিনি সাহসের সহিত পৃথ্বীরাজকেই বরমাল্য দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুশোভন সভামণ্ডপস্থ সুসজ্জিত রাজগণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না। সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া, পৃথ্বীরাজের হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির গলদেশে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্র দুহিতার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যে ম্রিয়মাণ হইলেন, স্বয়ম্বর-স্থলীর রাজগণ তাদৃশ রূপ-গুণ-সম্পন্ন ললনা-রত্ন লাভে হতাশ হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে সংযুক্তার মাল্যার্পণ-সংবাদ দিল্লীশ্বরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি সসৈন্যে কান্যকুব্জে আসিয়া সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন। জয়চন্দ্র কন্যারত্নের উদ্ধারার্থ যথাশক্তি চেষ্টা পাইলেন, কান্যকুব্জ হইতে দিল্লীতে যাইবার পথে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কিন্তু শেষে পৃথ্বীরাজের জয় লাভ হইল। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষুব্ধহৃদয়ে কান্যকুব্জে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল*।

* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বাররক্ষকের পদে স্থাপিত করাতে পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কান্যকুব্জে আগমন পূর্ব্বক জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন।

কেহ কেহ পৃথ্বীরাজকৃত সংযুক্তা-হরণ ঘটনা ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিবেশিত করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে ইহা উক্ত সময়ের পনর বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল†। যাহা হউক, পৃথ্বীরাজ এই অসামান্য ললনা-রত্নের অধিকারী হইয়া, অনুক্ষণ তদ্গতচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সংযুক্তার অসাধারণ গুণে স্বর্গ-সুখও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইল। সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্ত্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন।

পৃথ্বীরাজ যখন এইরূপ অনন্যসাধারণ দাম্পত্য-প্রেমের ক্রোড়ে লালিত, সংযুক্তা যখন এইরূপ পতি-সোহাগিনী হইয়া সৌভাগ্য-দোলায় দোলায়মান, তখন দুরন্ত সাহাবুদ্দীন গোরী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল। সংযুক্তা আসন্ন শত্রুর হস্ত হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্নপর হইলেন। কিরূপে যবন-সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে যবন-গ্রাস হইতে ভারতভূমি রক্ষা পাইবে, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে তোলপাড় করিতে লাগিল। তিনি ভর্ত্তাকে চতুরঙ্গ সৈনাদলের অধিনায়ক হইয়া, শীঘ্রই রণক্ষেত্রে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সংযুক্তার যত্ন কেবল এই অনুরোধ মাত্রেই শেষ হইল না। তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া, গম্ভীর ও উন্নত স্বরে পৃথ্বীরাজকে কহিলেন,—"জগতে কিছুই চিরস্থায়ী

ইহার পর সংযুক্তা পিতৃকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করেন, তিনি পৃথ্বীরাজকেই বিবাহ করিবেন। পৃথ্বীরাজ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়া পুনর্ব্বার সসৈন্যে কান্যকুব্জে আসিয়া, সংযুক্তাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন।

† আমাদের বিবেচনায় এই শেষোক্ত (১১৯০ খ্রীঃ অব্দ) সময়ই ঠিক। ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে যখন সংযুক্তার জন্ম, তখন ১১৭৫ অব্দে কি প্রকারে তিনি স্বয়ম্বরা হইবেন? পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা কখনও স্বয়ং পতি মনোনীত করিতে পারে না।

নহে। আমরা আজ যে জীবনস্রোতে দেহ ভাসাইয়া পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি, হয় ত কালই তাহা অনন্ত-সাগরে বিলীন হইতে পারে। ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া, যশের চিরন্তন সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। যিনি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি চির-কাল এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া, অমরতার দিকে মনোযোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমার অধিষ্ঠিত তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিত-স্রোতে সন্তরণ করুক, তোমার চতুরঙ্গ সৈন্যদল "হর হর" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করুক। এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয় করিও না, রণস্থলবর্ত্তিনী করাল সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও যত্নের সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, আমি পর-লোকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইব।" বীরবালা বীরজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজস্বি বাক্য নির্গত হইয়াছিল, এইরূপ তেজ-স্বিতা পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

অবিলম্বে সৈন্যগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল। ভার-তের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরগণ এই মহাযুদ্ধে শরীর ও মন উৎ-সর্গ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্য-কুলের 'হর হর' ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া সাহাবুদ্দীনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তর ভারতের নারায়ণপুর গ্রামে (তিরৌরী ক্ষেত্র) উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল। যবন সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের দুর্ন্ধার পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, শত্রুর পতাকা, শত্রুর

অস্ত্র পৃথ্বীরাজের করগত হইল। সাহাবুদ্দীন গোরী পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল। পৃথ্বীরাজ বিজয়ী হইয়া মহা উল্লাসে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরাজিত হইবার তুই বৎসর পরে সাহাবুদ্দীন আবার ভারতবর্ষে উপনীত হইল। এবারেও পৃথ্বীরাজ যুদ্ধার্থ সমুদ্ধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সমর-সংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈন্যগণ সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্ব্বার বিশাল সৈন্য-সাগরের আবির্ভাব হইল।

পরাক্রান্ত সমর সিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এজন্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। এক্ষণে সমর সিংহ পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থ সমাগত হইলেন। পৃথ্বীরাজ অমাত্যগণের সহিত সাত মাইল অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দিল্লীতে আনিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে দিল্লীর চারণগণ মধুর সংগীতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। সমর সিংহ পৃথ্বীরাজের সৌজন্য ও গুণগ্রাহিতায় বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি সাহসী, বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও সুনিপুণ যুদ্ধবীর ছিলেন। প্রকৃত বীরত্বের সহিত প্রকৃত শীলতার সৌন্দর্য্য তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তিনি আপনার সামন্তগণের যেমন প্রিয় ছিলেন, দিল্লীর সর্দ্দারগণের নিকটেও তেমনি সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এই সর্ব্বজন-প্রিয় সাহসী যোদ্ধা অভিযান ও যুদ্ধের প্রণালীর সম্বন্ধে যে সকল মত ব্যক্ত করিলেন, পৃথ্বীরাজ তাহা যত্নের সহিত লিখিয়া লইলেন। এদিকে যুদ্ধ-যাত্রীর সকলেই স্বস্ব পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইল। মাতা, তুহিতা, স্ত্রী, সকলেই

তাহাদিগকে 'রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণ-ভূমিতে দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ' বলিয়া বিদায় দিল। সংযুক্তা ভর্ত্তাকে বীর-সাজে সাজাইলেন; সাজাইতে সাজাইতে তাঁহার হৃদয় হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। সংযুক্তা অনিমেষ লোচনে পৃথ্বীরাজের দিকে চাহিলেন, অতর্কিত ভাবে কয়েকটী মুক্তাফল কপোল বহিয়া বক্ষে পতিত হইল। পৃথ্বীরাজ কালবিলম্ব না করিয়া, সৈন্যদল সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। সংযুক্তা ভর্ত্তার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস-সহকারে কহিলেন, "স্বর্গ ব্যতিরিক্ত বোধ হয়, আর এই যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) দয়িতের সহিত সম্মিলন হইবে না"।

সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চির দিন এক জনের পক্ষে থাকেন না,—চির-দিন কাহারও সমান যায় না। অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় একবার ঊর্দ্ধ আবার অধোগামী হইয়া, ইহলোকে সংসারের চাঞ্চল্য দেখাইতেছে। পৃথ্বীরাজ তিরৌরী-ক্ষেত্রে যে বিজয়-পতাকায় শোভিত হইয়াছিলেন, মুসলমানদিগের চাতুরী ও কালের নিয়তি-বলে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহা বিচ্যুত হইয়া পড়ে। সাহাবুদ্দীন গোরী একবার পরাজিত হইয়া আবার যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, হিন্দু-রাজগণ তাঁহাকে আত্মীয়ভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি যদি আপনার জীবন ভার বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু বহুসংখ্য সৈন্য অকালে মৃত্যু-মুখে পাতিত করিও না। স্বদেশে প্রতিগমন কর, নচেৎ রজনী প্রভাত হইলে আমাদের রণমত্ত সৈন্যগণ তোমার সৈন্যদলকে প্রথম বারের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে।" চতুর সাহাবুদ্দীন উত্তর করিলেন, "আমি জ্যেষ্ঠের আদেশে যুদ্ধে আসিয়াছি। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন প্রতিগমন

করিতে পারি না। যাবৎ অনুমতি না আইসে, তাবৎ যুদ্ধ বন্ধ রাখিতে পারি।" হিন্দু সৈন্য এই কথায় ভুলিয়া রাত্রিকালে নানা প্রকার উৎসবে মত্ত হইল। সাহাবুদ্দীন এই সুযোগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাগার নদীর তীরে মহম্মদ গোরীর সহিত এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান ছিল, ততক্ষণ হিন্দু সৈন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহাদের দেহ-রত্ন ভারত-ভূমির ক্রোড়শায়ী হইতে লাগিল। তিন দিন ঘোর-তর যুদ্ধের পর সমর সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। পৃথ্বীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া বন্দীভূত এবং শেষে শত্রুর হস্তে নিহত হইলেন। অনন্ত-প্রবাহ ক্ষত্রিয়-শোণিতে ভারতের দেহ কলঙ্কিত হইল, অনন্ত-প্রবাহ শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিতে লাগিল, সংযুক্তার অমঙ্গল আশঙ্কা ফলে পরিণত হইয়া গেল।

অবিলম্বে এই সাংঘাতিক সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিল। সংবাদ পাইবামাত্র সংযুক্তা চিতা সজ্জিত করিলেন, অবিলম্বে চিতানলের শিখা গগন স্পর্শ করিল। সংযুক্তা রত্নময় অলঙ্কার-রাশি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রক্তবস্ত্র-পরিহিত ও রক্ত-মাল্যে ভূষিত হইয়া এই অনলে প্রবেশ করিলেন। নিমেষ মধ্যে তাঁহার অনুপম লাবণ্য-ভূমি কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। সংযুক্তার জীবনের এই শেষ ভাগ কি ভয়ঙ্কর! কি লোম-হর্ষণ!

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন রণভূমিতে ছিলেন, ততদিন কেবল জল সংযুক্তার জীবন-রক্ষার অবলম্ব ছিল। চাঁদ কবির গ্রন্থের একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তার এই অসাধারণ পাতি-ব্রত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে। সংযুক্তা পতিব্রতার দৃষ্টান্ত-ভূমি,

স্বর্গস্থ দেবী-সমাজের বরণীয়া। পতিব্রতার শিরঃস্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাঁহার নাম সমাবেশিত হইবার যোগ্য।

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে সংযুক্তা-ঘটিত অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যে দুর্গ সংযুক্তার বিলাস-ক্ষেত্র ছিল, তাহার প্রাচীর আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে প্রাসাদে সংযুক্তা পতি-সোহাগিনী হইয়া অবস্থান করিতেন, তাহার স্তম্ভ-রাজি আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ শোভিত করিতেছে। কালের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে এই ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে এই ভগ্নাবশেষের ইষ্টক-রাশি অন্য প্রাসাদের দেহ পরিপুষ্টকরিবে, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্তা কখনও এই জগৎ হইতে অন্তরিত হইবেন না। তাঁহার পতি-প্রেম, তাঁহার পাতিব্রত্য, তাঁহার মহাপ্রাণতা চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসের হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান রাখিবে।

দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এলাহাবাদ হইতে প্রায় এক শত ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে গড়মণ্ডল নামে একটী পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। হিন্দুদিগের রাজত্বকালে সোহাগপুর, ছত্রিশগড়, সম্বলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত হয়। সোহাগপুর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। এই স্থানের অধিকাংশ অরণ্যে পরিবৃত। প্রকৃতির অনুকূলতা বশতঃ ইহা ধন-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রথিত আছে, ভোঁসলাবংশীয় মহারাষ্ট্র নৃপতিগণ বলপূর্ব্বক সোহাগপুরের রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। ছত্রিশগড় গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তঃপাতী। পূর্ব্বে ইহা রত্নপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সচরাচর ছত্রিশগড় জহর

খণ্ড নামে কথিত হইয়া থাকে। এই ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য ও পর্ব্বত-মালায় সমাকীর্ণ।

গড়মণ্ডল রাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। ইহার কোথাও লোকাকীর্ণ পল্লী, সুরম্য জলাশয়, কমনীয় উপবন নেত্র-তৃপ্তিকর গ্রামীণতার অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে, কোথাও প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণী বৃক্ষ-সমাকীর্ণ বনভূমির প্রান্ত-দেশে রজত-মালার ন্যায় পরিশোভিত হইতেছে, কোথাও নবীন লতা-সমূহে সুদৃশ্য পুষ্প ও পল্লবে সজ্জিত হইয়া বাসন্তী লক্ষ্মীর মহিমা বাড়াইয়া দিতেছে, কোথাও ভীম-দর্শন পর্ব্বত স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাট্ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং কোথাও প্রস্রবণ-সমূহ পরিস্কৃত সলিল দান করিয়া অরণ্যেচর জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। গড়-মণ্ডলের রাজধানী প্রসিদ্ধ গড় নগর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণতীরে জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ মাইল অন্তরে অবস্থিত ছিল। ইহা শৈলমালায় পরিবেষ্টিত থাকাতে শত্রুপক্ষের দুরাক্রম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। হিন্দুদিগের রাজত্বের পর যবন রাজগণ দিল্লীর সিংহাসন অধীন করিয়া চারিদিকে আপনাদের ক্ষমতা প্রসারিত করিতেছিলেন; ক্রমে ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য তাঁহাদের অর্দ্ধ-চন্দ্র চিহ্নিত পতাকায় শোভিত হইতেছিল; কিন্তু কখনও গড়-মণ্ডলে তাঁহাদের প্রতাপ প্রবেশ করে নাই। যবন ভূপতিগণের সৈন্যসাগরের প্রবল তরঙ্গ ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম পূর্ব্বক গড়রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য তিন শত মাইল ও বিস্তার এক শত মাইল ছিল।

মোগলবংশীয় আকবর শাহ যখন দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ

করেন, তখন চন্দন নামে মহবা-রাজের কন্যা পতিবিহীনা দুর্গাবতী গড়-রাজ্যের অধিপত্নী ছিলেন। কথিত আছে, তৎকালে দুর্গাবতীর ন্যায় রূপ-লাবণ্যবতী মহিলা ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দুর্গাবতীর কেবল সৌন্দর্য্য অসাধারণ ছিল না; তাঁহার প্রকৃতিও অসাধারণ ছিল। দুর্গাবতী অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও তেজস্বিনী ছিলেন, এবং বাল্যকাল হইতে পর-বশে থাকিয়াও রাজ্য-শাসনের সমুদয় কৌশল শিখিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনা সর্ব্বদা অপ্রতিহত থাকিত, এবং তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল সাধনে যত্ন দেখাইত। লোকে রণভূমিতে তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া যেমন ভীত হইত, আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে কোমলতা ও মৃদুতা দেখিয়া তেমনি প্রীতি লাভ করিত। দুর্গাবতী তেজস্বিতা ও কোমলতা উভয়েরই অবলম্ব ছিলেন, উভয়ই তাঁহার হৃদয়কে সমুন্নত ও সমলঙ্কৃত করিয়াছিল।

আকবর শাহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিরাম খাঁ নামে তাঁহার প্রধান কার্য্য-সচিবের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অবাধ্য আমীর ও ভূস্বামিদিগকে শাসন করিবার জন্য নানা-স্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সেনাপতিদিগের মধ্যে আসফ খাঁ নামে একজন উদ্ধত-স্বভাব সেনাপতি নর্ম্মদা নদীর তটবর্ত্তী প্রদেশ শাসনার্থ প্রেরিত হন। আসফ খাঁ গড়-মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং এই রাজ্য হস্তগত করিবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। আকবর শাহ স্বাধিকার সম্প্রসারিত করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না; তিনি সেনাপতিকে গড় রাজ্য অধিকার-ভুক্ত করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সম্রাটের আদেশ ও উৎসাহে সাহসী হইয়া ১৫৬৪

খ্রীষ্টাব্দে আসফ ছয় হাজার অশ্বারোহী ও বার হাজার পদাতি সমভিব্যাহারে গড়মণ্ডল আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন।

অবিলম্বে এই অভিযান-বার্ত্তা গড়রাজ্যে ঘোষিত হইল। রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই এই আকস্মিক আক্রমণ-সংবাদে যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর হৃদয়ে কিছুমাত্র ভীতির সঞ্চার বা কর্ত্তব্য-বিমুখতার আভাস লক্ষিত হইল না; তিনি অকুতোভয়ে, প্রগাঢ় সাহস সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ সমর-সংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, সৈন্যগণ যুদ্ধাভরণে অলঙ্কৃত ও রণমদে উন্মত্ত হইয়া সমবেত হইতে লাগিল, রণপণ্ডিত সেনা-পতিগণ একে একে আসিয়া সৈন্যগণের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দুর্গাবতীর বীরবল্লভ নামে অষ্টাদশ বর্ষ-বয়স্ক একটী পুত্র-সন্তান ছিল, এই যুবকও অমিতবিক্রমে আসিয়া যুদ্ধ-যাত্রীর দলে মিলিত হইলেন। দুর্গাবতী এই সৈন্য-সমষ্টির শৃঙ্খলা বিধান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ বেশে সজ্জিত হইয়া শিরোদেশে রাজ-মুকুট, এক হস্তে শাণিত শূল ও অপর হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া গজপৃষ্ঠে আরোহণ করি-লেন। কামিনীর কোমল হৃদয় এখন স্বদেশের স্বাধীনতা, স্ববংশের সম্মান রক্ষার্থ অটলতা ও কঠোরতার আস্পদ হইল। দুর্গাবতী যখন আট হাজার অশ্ব, দেড় হাজার হস্তী ও সৈন্যদল সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন, তখন তাঁহার তদা-নীন্তন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে যবন-সৈন্য সন্ত্রস্ত হইল এবং তাহাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভীতি সঞ্চারিত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে বাধা দিতে লাগিল। দুর্গাবতী প্রবল পরাক্রমের সহিত দুই-বার আসফ খাঁর সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন, দুইবারেই তাঁহার

জয়লাভ হইল। যবন সৈন্য রাণীর সেনাগণের অমিত বিক্রমে ক্ষণকাল মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তাহাদের ছয় শত অশ্বারোহীর দেহরক্ত সমরক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, শেষে সকলে রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। দুর্গাবতী দ্বিতীয় বার শত্রুসেনার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। শেষে সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হইল দেখিয়া, তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু এই বিশ্রাম-সুখই তেজস্বিনী দুর্গাবতীর পক্ষে মহা অমঙ্গলের নিদান হইয়া উঠিল। গড়মণ্ডল-বাসী সৈন্যগণ সেই সময়ে, সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবার জন্য জিদ করাতে দুর্গাবতী কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সেই রাত্রিতেই মুসলমান সেনা-নিবাস আক্রমণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার এই অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হইলে আসফ খাঁর সৈন্যগণ নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। কিন্তু বীর্য্যবতী বীর-জায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না, সৈন্যগণের সকলেই ঈদৃশ প্রস্তাবে অসম্মতি দেখাইল, এবং সকলেই তাঁহাকে বিনয়-সহকারে নিশীথে যবন-সৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল। দুর্গাবতী এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এদিকে আসফ খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; যুদ্ধে দুইবার পরাজিত হওয়াতে তিনি হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে গড়মণ্ডলের সৈন্যগণের বিশ্রাম করার সংবাদে তিনি সাতিশয় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামান ও সৈন্যদল লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। প্রভাত না হইতে হইতেই তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। গড়মণ্ডলবাসী সৈনিকগণ শান্তি-দায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি-সুখ অনুভব করিতেছিল, আসফ খাঁ সেই সুযোগে তাহাদিগকে

আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বে দুর্গাবতীর সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল, দুর্গাবতী এই আকস্মিক আক্রমণেও কিছু-মাত্র ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন না। তিনি আপনার সৈন্য-দিগকে একত্র করিয়া একটী সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট আশ্রয়পূর্ব্বক শত্রু-পক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলা-বর্ষণে সে স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না; সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একটী প্রশস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই প্রশস্ত সমর-স্থলে উপস্থিত হইয়া কুমার বীরবল্লভ অসা-ধারণ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আঠার বৎসরের তরুণ বীর পুরুষের এই লোকাতীত পরাক্রম দর্শনে যবন-সৈন্য স্তম্ভিত-প্রায় হইল। কিন্তু শেষে বহুসংখ্য যবনের আক্রমণে বীরবল্লভ আহত হইয়া অশ্ব হইতে পতনোন্মুখ হইলেন। দুর্গা-বতী প্রাণাধিক পুত্রের কাতরতা দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হই-লেন না, পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিক বিক্রমে রণ-কৌশল দেখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্গাবতীর অধিকাংশ সৈন্য বীর-শয্যায় শয়ন করিয়া-ছিল, অধিকাংশ সৈন্যের দেহরাশিতে সমরস্থল ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছিল, চারিদিকে যবন-সৈন্য উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় বিশ্ব-ত্রাস গর্জ্জনে ক্রমে তাঁহার সম্মুখীন হইতেছিল, দুর্গাবতী কেবল তিন শত মাত্র পদাতি লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শত্রু-নিক্ষিপ্ত একটী সুতীক্ষ্ণ শর হঠাৎ তাঁহার এক চক্ষে বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী এই বাণ বলপূর্ব্বক নেত্র হইতে নিঃসারিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসারিত না হইয়া চক্ষু-কোটরেই বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইহার

পর আর একটী তীর প্রবলবেগে তাঁহার গ্রীবাদেশে আসিয়া পতিত হইল ; দুর্গাবতী এইরূপে পুনঃ পুনঃ শরাহত হইয়া কাতর হইলেন, চারিদিক্ তাঁহার নিকট অন্ধকারে আচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল, এখন তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে অভিপ্রায়ে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া বিপুল বিক্রমে যবন-সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় অনুসারে সমর-ক্ষেত্রে প্রাণ-প্রিয় পুত্র-সন্তানের শোচনীয় দশাও অকাতরভাবে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সে অভিপ্রায় সিদ্ধির আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু দুর্গাবতী ঈদৃশী অবস্থাতেও ভীরুর ন্যায় সমর-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন না, ভীরুর ন্যায় বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া শত্রুর পদানত হইলেন না। বীরাঙ্গণা বীর-ধর্ম্ম রক্ষার্থে সমর-ক্ষেত্রেই দেহপাত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত-ধারা বাহির হইয়া তাঁহার দেহ প্লাবিত করিল, শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, শারীরিক তেজ ক্ষীণতর হইয়া পড়িল, তখন তিনি অম্লান বদনে ও ধীরভাবে সমীপবর্ত্তী একজন কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন, এবং অম্লানবদনে ও ধীরভাবে উহা স্বীয় দেহে প্রবেশিত করিয়া রুধিরে রঞ্জিত করিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার লাবণ্য-লীলভূমি কমনীয় দেহ শব-সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ছয়জন সৈনিক পুরুষ দুর্গাবতীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা এই অসম সাহসিকতার কার্য্য দর্শনে জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্র বেগে শত্রুদলের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বহুসংখ্য যবন-সৈন্য মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

যে স্থানে দুর্গাবতী প্রাণ পরিত্যাগ করেন, পর্য্যটকগণ আজ পর্য্যন্ত পথ অতিবাহন সময়ে সেই স্থল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহা একটী সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট। ইহার নিকটে দুটী অতি প্রকাণ্ড গোলাকার প্রস্তর রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, দুর্গাবতীর রণ-দুন্দুভিদ্বয় এক্ষণে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। রাত্রি-শেষে সমীপ-বর্ত্তী অরণ্য-প্রদেশ হইতে এই দুন্দুভি-ধ্বনি শুনা গিয়া থাকে। যাহাহউক, একটী প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত এই গিরি-সঙ্কটের সম্বন্ধ থাকাতে ইহা একটী প্রধান দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই গম্ভীর স্থানের গম্ভীর দৃশ্য অবলোকন করিলে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে। যবন সেনাগণ গড় নগর লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ খাঁ বিশ্বাসঘাতক হইয়া অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন, কথিত আছে তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে এক শতটী স্বর্ণ মুদ্রা-পরিপূর্ণ কলস পাইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত সূতগণ দুর্গাবতীর অক্ষয় কীর্ত্তি-কাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া মধুর বীণা সংযোগে নানা স্থানে গাইয়া বেড়ায়। কালের কঠোর আক্রমণে গড় রাজ্য এক্ষণে পূর্ব্বগৌরব-ভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। যত দিন স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, যত দিন অতুলনীয় বীরত্ব অদীনপরাক্রম বীরেন্দ্র সমাজের এক মাত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, যতদিন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই পবিত্র ও মধুর বাক্য স্বদেশ-বৎসল ব্যক্তির কোমল হৃদয় অচিন্ত্যপূর্ব্ব অমৃত-প্রবাহে অভিষিক্ত করিবে, এবং যত দিন আত্মাদর ও আত্ম-সম্মান পাপ ও কুপ্রবৃত্তির মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া গগনস্পর্শী গিরিবরের ন্যায় উন্নত থাকিবে, ততদিন দুর্গাবতীর পবিত্র কীর্ত্তির বিলয় হইবে না।